ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে
Love for All
Hatred for None

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক আহ্‌মদী

The Ahmadi
Fortnightly
Since 1922

নব পর্যায় ৭৮ বর্ষ | ২১তম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ | ৭ শাবান, ১৪৩৭ হিজরি | ১৫ হিজরত, ১৩৯৫ হি. শা. | ১৫ মে, ২০১৬ ঈসায়ী

সস
সত্যের সন্ধানে

আবারও সত্যের সন্ধানে

২৬ মে থেকে ২৯ মে টানা ৪ দিন ব্যাপী
টেলিফোন ঃ ০০-৪৪-২০৮-৬৮৭-৮০১০
ফ্যাক্স ঃ ০০-৪৪-২০৮-৬৮৭-৮০৩৭
ই-মেইল ঃ sslive@mta.tv

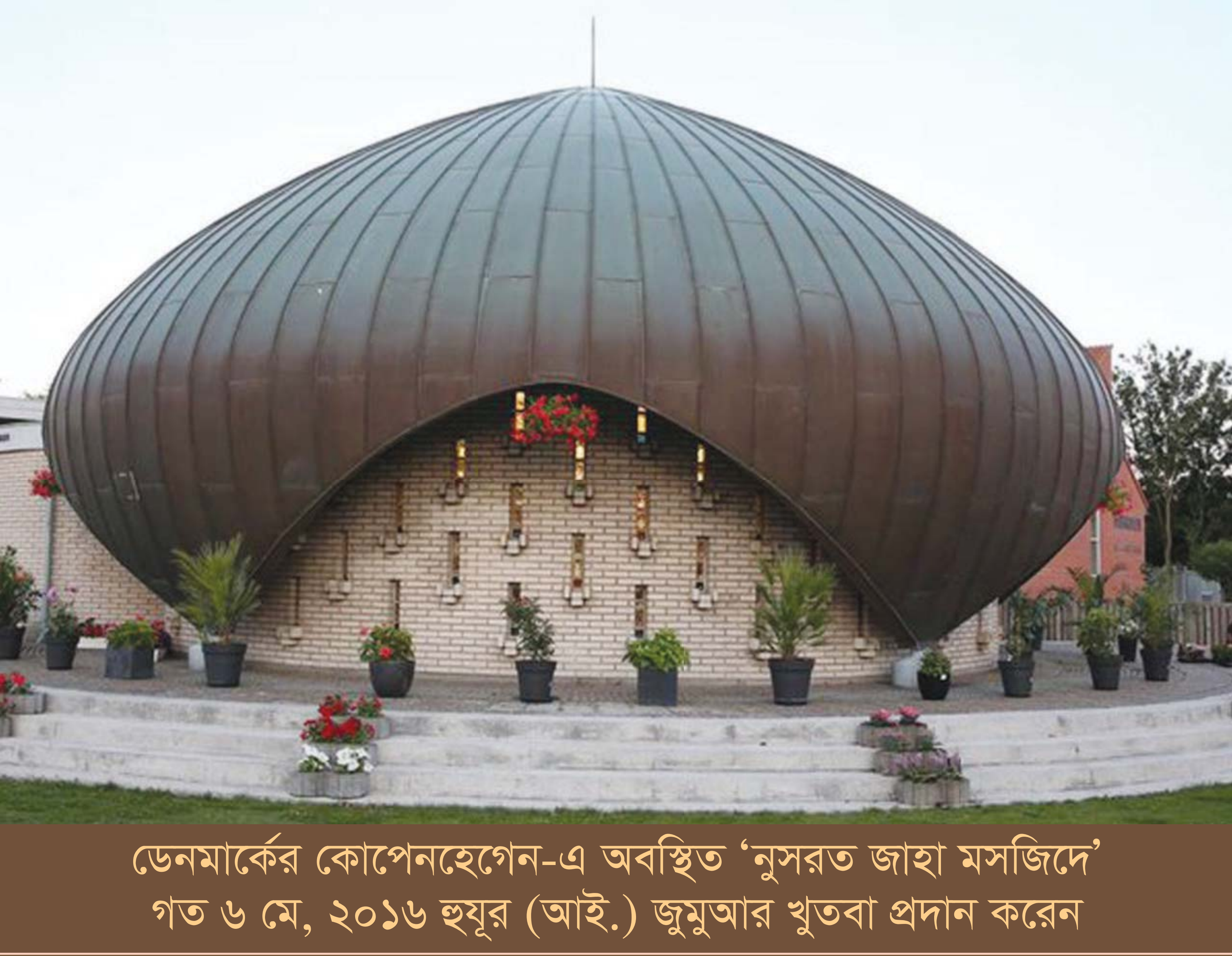

ডেনমার্কের কোপেনহেগেন-এ অবস্থিত 'নুসরত জাহা মসজিদে' গত ৬ মে, ২০১৬ হুযূর (আই.) জুমুআর খুতবা প্রদান করেন

খুতবার সংক্ষিপ্তরূপ পড়ুন ভিতরের পাতায়

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ

আহমদীয়া মুসলিম জামাত-এর সদস্যগণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশে ৭ বছর মেয়াদী শাহেদ কোর্সে ১১তম ব্যাচে ছাত্র ভর্তি করা হবে। এ বছর ভর্তিচ্ছুদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে বলে আমরা আশা করছি। ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের দরখাস্ত আগামী ২৫/০৫/২০১৬ তারিখের মধ্যে সেক্রেটারী, বোর্ড গভর্ণরস জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ বরাবরে পৌঁছাতে হবে। আবেদনকারীদের ভর্তি পরীক্ষা ৩১/০৫/২০১৬ তারিখ রোজ মঙ্গলবার থেকে ০৩/০৬/২০১৬ তারিখ রোজ শুক্রবার পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে, ইনশাআল্লাহ্। আবেদনকারীদেরকে ৩০/০৫/২০১৬ তারিখ রোজ সোমবার বিকাল ৫.০০ টার পূর্বে জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের অফিসে পৌঁছে অবশ্যই রিপোর্ট করতে হবে।

আবেদনকারীর যোগ্যতা হবে নিম্নরূপ ঃ (১) এস. এস. সি/এইচ. এস. সি-তে উত্তীর্ণ হতে হবে এবং নূন্যতম "বি" গ্রেড থাকতে হবে। (২) এ বছর এইচ.এস.সি অংশগ্রহণকারীরাও আবেদন করতে পারবেন। তবে এস.এস.সি-তে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সাপেক্ষে। (৩) ভাল স্বাস্থ্য ও মেডিকেল চেক-আপে উত্তীর্ণ হতে হবে। (৪) সর্বোচ্চ বয়স সীমা, এস.এস.সি উত্তীর্ণদের জন্য ১৭ এবং এইচ.এস.সি উত্তীর্ণদের জন্য ১৯ বছর। (৫) ওয়াকফে নও প্রার্থী ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে অগ্রাধিকার পাবে। (৬) কুরআন শুদ্ধভাবে পড়া অবশ্যই জানতে হবে, ধর্মীয় সাধারণ জ্ঞানে ভাল হতে হবে এবং জামাতী বই পড়ার অভ্যাস থাকতে হবে। (৭) জীবন উৎসর্গকারী হতে হবে। (৮) ভাল আহমদী ও তাকওয়াশীল এবং জামাতি কাজে অংশগ্রহণকারী হতে হবে। (৯) আরবী, উর্দু ও ইংরেজী ভাল জানা থাকলে অগ্রাধিকার পাবে। (১০) বয়া'ত গ্রহণকারীর ক্ষেত্রে কমপক্ষে তিন বছর অতিক্রান্ত হতে হবে। (১১) ভর্তির জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ও এপ্টিচিউড টেষ্টে ভাল ফলাফল করতে হবে। (১২) আবেদন পত্রে নিম্নলিখিত তথ্যাবলী এবং নিজ বাড়ি অথবা জামাতের ফোন/মোবাইল নম্বর উল্লেখ করতে হবে।

(ক) নিজের নাম (খ) পিতার নাম (গ) মাতার নাম (ঘ) জন্ম তারিখ এবং বয়আত গ্রহণকারী হলে বয়া'তের তারিখ (ঙ) শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেট এর সত্যায়িত ফটো কপি (চ) নিজ হস্তে আবেদন পত্র লিখতে হবে (ছ) আবেদন পত্রে স্থানীয় আমীর/প্রেসিডেন্টের সত্যায়ন থাকতে হবে নচেৎ আবেদন পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে (জ) জামাতি ও মজলিসি চাঁদা পরিশোধ মর্মে স্থানীয় সেক্রেটারী মাল/নায়েম মালের সার্টিফিকেট সংযুক্ত করতে হবে (ঝ) ওয়াকফে নও হলে নম্বর উল্লেখ করতে হবে (ঞ) অন্য কোন বিশেষ যোগ্যতা থাকলে উল্লেখ করতে পারেন (ট) জামাতের এমন দুইজন বিশেষ ব্যক্তির নাম উল্লেখ করতে হবে যিনি আবেদনকারীকে ভাল ভাবে চিনেন ও জানেন (ঠ) জামাতের কোন বুযুর্গ (মৃত বা জীবিত) এর সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকলে উল্লেখ করতে হবে।

ভর্তি-বিজ্ঞপ্তিটি সকল স্থানীয় জামাত, হালকা ও পকেট সমূহে ব্যাপক প্রচারের জন্য বিনীত অনুরোধ জানানো হলো। প্রয়োজনে যেসব মোবাইল নম্বরসমূহে যোগাযোগ করা যেতে পারেঃ ০১১৯১৩৬৩৪১৮, ০১৬৭৭৪৮৬৩৫৯, ০১৭৫৫৫৬৫৩০৯, ০১৯২২০২৪৫৯১

মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ
সেক্রেটারী, বোর্ড অফ গভর্ণরস
জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

"Love For All, Hatred For None."
Hakim Watertechnology
"Best Water, Best Life"
House hold/Official
Commercial/Industrial
Pet Bottling
46/A Kakrail (VIP Roa), 2nd Floor, Dhaka-1000,Tel: 02-9337056, Cell: 01611-338989, 01711-338989
E-mail: hakimwater@gmail.com, Web: www.hakimwatertechnology.com

সম্পাদকীয়

আহমদীয়া খিলাফত: জগতময় কল্যাণ বিতরণ ধারা

হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর সাহাবায়ে কেরাম (রা.) সম্মিলিতভাবে হযরত আবু বকর সিদ্দীক(রা.)কে সর্বজন মান্য ইমাম রূপে গ্রহণ করে তাঁর হাতে বয়আত গ্রহণ করে ইসলামের কল্যাণ বিতরণ ধারাকে খিলাফত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সচল রেখেছিলেন। এই ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে এটা পরিষ্কার যে, মুসলিম উম্মাহ কখনই নেতৃত্বহীন থাকতে পারে না বরং সকল প্রকার কল্যাণ ও উন্নতির চাবিকাঠি এই খিলাফতের মাঝেই নিহিত। কিন্তু দুর্ভাগ্য মুসলিম জাতির। এই মহা কল্যাণ থেকে মাত্র তিরিশ বছর পেরোতেই তারা বঞ্চিত হয়ে গেল।

তবে মহানবী (সা.)-এর শুভ সংবাদ অনুযায়ী হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর মাধ্যমে এই ঐশী-কল্যাণ বিতরণ- ধারা পুণরায় সংস্থাপিত হয়েছে। আর এই কল্যাণময় ধারা কিয়ামত পর্যন্ত শেষ হবার নয়।

আহমদীয়া খিলাফত আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে বিশেষ আশিস প্রাপ্ত সেই খেলাফত, যার ধারাবাহিকতায় আজ হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) এর পঞ্চম খিলাফতকাল চলছে। তাঁরই খিলাফতকালে শতবর্ষ উদযাপন করার তৌফিক খোদা তা'লা আমাদের দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ। খোদা তা'লার সাহায্য ও সমর্থনের ছায়া সর্বদা আহমদীয়া খেলাফতের ওপর পরিব্যাপ্ত।

তৌহীদের ধ্বনী উচ্চকিত করতে এ জামা'ত প্রায় প্রতিদিনই একটি করে মসজিদ লাভ করছে আহমদীয়া খিলাফতের মাধ্যমে।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর এর মিশন একদিকে রোম আর অন্যদিকে পারস্য পর্যন্ত এক খোদার বাণী পৌঁছাচ্ছে এবং কোটি কোটি হৃদয় আজ হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কলেমা উচ্চারণ করে ইসলামের পতাকা তলে আশ্রয় নিচ্ছে। সারা পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র তৌহীদ প্রতিষ্ঠা লাভ করছে।

এই খিলাফতের অধীনে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত শত শত মসজিদ, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করার পাশাপাশি কোটি কোটি দুর্দশাগ্রস্ত লোকদের খাদ্য ও বাসস্থানের ব্যবস্থাও করছে। সেবার কোন ক্ষেত্র দৃষ্টিতে এলেই, নির্দ্বিধায় ঝাপিয়ে পড়ছে। এ সেবা দুর্ভিক্ষ ও খড়া কবলিত এলাকা হোক, ভূমিকম্প প্রপীড়িত লোকদের প্রয়োজন দেখা দিক, প্লাবনে আক্রান্ত লোকদের সাহায্যের প্রশ্ন আসুক, সিডর কবলিত এলাকার কথা আসুক, এমনকি উন্নত পাশ্চাত্য রাষ্ট্রেও ভূমিকম্প বা অকস্মাৎ বন্যায় আক্রান্ত বাস্তুহারা লোকদের খাবার পৌঁছানোর সুযোগ আসুক জামা'তে আহমদীয়ার স্বেচ্ছা-সেবীগণ সেবার ঝান্ডা সমুন্নত রেখে অবনত মস্তকে খলীফার নির্দেশে সর্বান্তকরণে সেবায় নিয়োজিত থাকে। আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত আন্তর্জাতিক সেবামূলক সংগঠন **"Humanity First"** এর মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে নিস্বার্থ ভাবে এই সেবা করে যাচ্ছে, যে কারণে বিশ্বসংস্থা জাতিসংঘ **Humanity First**-কে রেজিষ্ট্রিভুক্ত করে নিয়েছে।

মুসলিম জাহান আজ চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন। শ্রেষ্ঠ-নবীর অনুসারী মুসলমানরা সর্বগ্রাসী অবক্ষয়ের শিকার হয়ে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত। সবাই যুদ্ধের মুখোমুখি, স্বার্থের দ্বন্দে রণসাজে সজ্জিত, যে কোন সময় বিপর্যয় ঘটতে পারে, তাই সময় থাকতে এ বিপর্যয় থেকে উদ্ধারের রাস্তা বের করা উচিত। সমস্ত মুসলিম আজ শতধা বিভক্ত হয়ে পরস্পর ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত, আর মুসলমানদের এই অনৈক্যের কারণেই তারা ভ্রাতৃঘাতী দ্বন্দ্ব সংঘাতে লিপ্ত হচ্ছে। সারা পৃথিবীর বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাওয়ার একটি মাত্র রাস্তা খোলা আছে, আর তা হলো খোদা-প্রদত্ত নেতার আনুগত্য করা। নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ইমাম বিশ্ব-নেতৃবর্গকে আর বড় বড় সব পার্লামেন্ট ভবনে বিরামহীনভাবে সেই আহ্বানই করে চলছেন। সমগ্র মুসলিম-দেশ যদি আজ এক নেতার আনুগত্য স্বীকার করে তাঁর দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী চলত, তাহলে এতসব দুর্যোগ হানা দিত না।

যারা আজ এই ঐশী-খিলাফতের নেতৃত্বে নিজেকে সম্পৃক্ত করেছেন, তারা অনেক সৌভাগ্যবান। তারা খোদার আদেশ অনুযায়ী এক ইমামের আশ্রয়ে আছেন এবং সম্পূর্ণ নিরাপদ এক দূর্গে আছেন। আলহামদুলিল্লাহ। হ্যাঁ! এ কথা দাবীর সাথেই বলতে পারি, সমগ্র পৃথিবীতে যে বিপর্যয় দেখা দিচ্ছে, তা থেকে খোদা তা'লা আহমদীয়া সদস্যদেরকে মুক্ত রেখেছেন এবং ভবিষ্যতেও রাখবেন, ইনশাআল্লাহ্। খলীফার দোয়ার ফলে খোদা তা'লা সকল আহমদীকে হেফাযত করছেন।

এ ঐশী-খিলাফতের আশ্রয়ে আমরা আছি, তাই আমাদেরও দায়িত্ব অনেক। আজ আমরা পঞ্চম খলীফার দয়ার চাদরে আবৃত। আমাদের উচিত, খিলাফতের প্রতি আনুগত্যের মান পূর্বের চেয়ে আরো উন্নত করা। খিলাফত শতবর্ষ জুবিলীর উৎসবে বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) যে অঙ্গীকার আমাদের কাছ থেকে নিয়েছেন, তার কতটুকু আমরা বাস্তবায়ন করছি-তা খতিয়ে দেখা দরকার। সেদিন আমরা অঙ্গীকার করেছিলাম **“আমরা ইসলাম ও আহমদীয়াতের প্রসার আর হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নাম পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছানোর জন্য জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চেষ্টা করে যাবো। এই পবিত্র দায়িত্ব সম্পাদনের লক্ষ্যে সর্বদা আমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.) এর জন্য আমাদের জীবন উৎসর্গ করে রাখবো এবং সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করে কিয়ামত পর্যন্ত ইসলামের পতাকাকে বিশ্বের প্রতিটি দেশে সমুন্নত রাখবো। খিলাফত ব্যবস্থার সুরক্ষা ও এর দৃঢ়তার লক্ষ্যে আমরা জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অবিরাম চেষ্টা করে যাবো এবং বংশ পরম্পরায় নিজ সন্তান সন্ততিদেরকে খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকা ও এর কল্যাণরাজী অর্জনের বিষয়ে সচেষ্ট থাকার নসীহত করে যাবো, যেন কিয়ামত পর্যন্ত আহমদীয়া খিলাফত সুরক্ষিত থাকে এবং কিয়ামত পর্যন্ত আহমদীয়া জামা'তের মাধ্যমে ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসার অব্যাহত থাকে। আর মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর পতাকা যেন অন্য সব পতাকার উর্ধ্বে উড্ডীন থাকে”**।

আমাদের প্রত্যেকেরই ‘খেলাফতে আলা মিনহাযেন নবুওয়াতের’ ধারায় পুণ:প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এই মাসটিতে আত্মজিজ্ঞাসা করা উচিত যে, যুগ-খলীফার সাথে কৃত অঙ্গীকার প্রতিপালনে আমরা কতটুকু তৎপর রয়েছি? খোদা তা'লা আমাদের সবাইকে যুগ-খলীফার সকল নির্দেশ যথার্থরূপে পালনের মাধ্যমে স্বীয় অঙ্গীকার পূর্ণ করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

সূচিপত্র

১৫ মে, ২০১৬

কুরআন শরীফ ৩

হাদীস শরীফ ৪

অমৃত বাণী ৫

'বারাহীনে আহমদীয়া'
হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ ৬

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ৯
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর
১৫ এপ্রিল, ২০১৬ তারিখের **জুমুআর খুতবা**

ইযালা-এ-আওহাম (সন্দেহ-সংশয় নিরসন) ১৭
প্রণয়ন ও প্রকাশনা ১৮৯১
হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ১৯
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর
১ জানুয়ারি, ২০১৬ তারিখের **জুমুআর খুতবা**

ইসলাম আহমদীয়াত-এর ৫ম খিলাফত ২৭
প্রদীপ্ত সত্যতায় উদ্ভাসিত
মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ

কলমের জিহাদ ৩২
মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

এক নেতা এক জামা'ত ৩৪
এরই নাম আহমদীয়া খিলাফত
মাহমুদ আহমদ সুমন

মানুষের ভাল-মন্দ আল্লাহ্ নির্ধারণ করেন ৩৬
মোহাম্মদ সালাউদ্দীন ঢালী

ভালো মানুষ ৩৮
মওলানা শরীফ আহমদ আফ্রাদ

কুরআন শরীফ পাঠ ও শ্রবণকারীর জন্য ৪১
কিছু জরুরী নির্দেশ
ভাষান্তর ঃ মওলানা মোহাম্মদ রুহুল বারী

মহানবী (সা.)-এর আবির্ভাবের পূর্বে মক্কা ও মদীনাতে ৪২
ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের আগমনের কারণ
সাকিবুল হাসান (মহসিন)

সংবাদ ৪৪

আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ ৪৭

বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে হুযূর (আই.)-এর ৪৮
বিশেষ দোয়ার তাহরীক

কুরআন শরীফ

সূরা আন্‌ নাহ্‌ল-১৬

৫৪। আর যে কল্যাণই তোমাদের কাছে রয়েছে তা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। এরপর দুঃখকষ্ট যখন তোমাদের ওপর নেমে আসে তখন তোমরা (বিনত হয়ে) তাঁরই কাছে ফরিয়দ করে থাক।	وَمَا بِكُمْ مِّنْ نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْـَٔرُوْنَ ۚ ٥٤
৫৫। এরপর তিনি যখন তোমাদের কাছ থেকে সেই কষ্ট দূর করে দেন তোমাদের এক দল তখনই নিজেদের প্রভু-প্রতিপালকের সাথে শরীক করতে আরম্ভ করে।	ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيْقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُوْنَ ۙ ٥٥
৫৬। এতে করে আমরা তাদের যা দিয়েছি তারা তা অস্বীকার করে। অতএব তোমরা সাময়িক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করে নাও। এরপর তোমরা অবশ্যই (এর পরিণাম) জানতে পারবে।	لِيَكْفُرُوْا بِمَآ اٰتَيْنٰهُمْ ۭ فَتَمَتَّعُوْا ۫ قف فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ٥٦
৫৭। আর তাদেরকে যে রিয্‌ক দান করেছি তারা এর একটি অংশ তাদের (সেইসব মিথ্যা উপাস্যদের) জন্য নির্ধারণ করে বসে যাদেরকে তারা চিনেও না। আল্লাহ্‌র কসম! তোমরা যে মিথ্যা বানিয়ে বলছ সে বিষয়ে অবশ্যই তোমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।	وَيَجْعَلُوْنَ لِمَا لَا يَعْلَمُوْنَ نَصِيْبًا مِّمَّا رَزَقْنٰهُمْ ۭ تَاللّٰهِ لَتُسْـَٔلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُوْنَ ٥٧
৫৮। আর তারা আল্লাহ্‌র জন্য কন্যাসন্তান বানিয়ে নিয়েছে। তিনি পবিত্র। অথচ তাদের (নিজেদের) জন্য তা-ই রয়েছে যা তারা পছন্দ করে[১৫৫২]।	وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ الْبَنٰتِ سُبْحٰنَهٗ ۙ وَلَهُمْ مَّا يَشْتَهُوْنَ ٥٨

১৫৫২। এস্থলে আপত্তি এটি নয় যে, কাফিররা আল্লাহ্‌ তা'লার জন্য কন্যাসন্তান কেন বানিয়ে নিয়েছে, পুত্রসন্তান কেন বানায়নি। কেননা পবিত্র কুরআন পুত্রসন্তান নির্ধারণকেও স্পষ্ট নিন্দা করেছে (১৯ঃ৯১-৯২)। তফসীরাধীন আয়াত শুধু কাফিরদের নির্বুদ্ধিতার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছে, তারা আল্লাহ্‌ তা'লার প্রতি কন্যাসন্তান আরোপ করেছে, অথচ তারা নিজেরাই তাদের প্রতি কন্যাসন্তান আরোপকে অবমাননাকর মনে করে।

হাদীস শরীফ

নবুওয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত

হাদীস ঃ

আন হুযায়েফাতা (রা.) ক্বালা ক্বালা রাসূলুল্লাহে (সা.) তাকুনু নাবুওয়াতু ফিকুম মাশাআল্লাহু আন তাকুনা সুম্মা ইয়ারফাউহাল্লাহু তা'লা সুম্মাতাকুনু খিলাফতুন 'আলা মিনহাজিন নবুওয়াতে মাশাআল্লাহহু আন তাকুনা সুম্মা ইয়ারফাউহুহাল্লাহু তা'লা সুম্মাতাকুনু মুলকান আযযান ফাতাকুনু মাশাআল্লাহু আন তাকুনা সুম্মা ইয়ারফাউহাল্লাহু তাআলা সুম্মা তাকুনা মুলকান জাবা রিয়্যাতান ফাতাকুনু মাশাআল্লাহু আনতাকুনা ইয়ারফাউহাল্লাহু তা'লা সুম্মা তাকুনু খিলাফাতুন 'আলা মিনহাজিন নুবুওয়াতে সুম্মা সাকাতা।

অর্থাৎ হযরত হুযায়েফা (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, তোমাদের মাঝে নবুওয়ত ততক্ষণ পর্যন্ত থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ চাইবেন, অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা তা উঠিয়ে নিবেন। এরপর নবুওয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তা ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'লা চাইবেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা তা উঠিয়ে নিবেন। তখন যুলুম, অত্যাচার, উৎপীড়নের রাজত্ব কায়েম হবে। তা ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ চাইবেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা তা উঠিয়ে নিবেন। তখন তা অহংকার ও জবরদস্তিমূলক সাম্রাজ্যে পরিণত হবে এবং তা ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ চাইবেন। তখন নবুওয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। অতঃপর তিনি (সা.) নীরব হয়ে গেলেন (মুসনাদ আহমদ, মিশকাত)।

ব্যাখ্যা ঃ

পবিত্র কুরআন হতে এ বিষয়টি পরিষ্কার যে, আল্লাহ্ তা'লা ঈমান আনয়নকারী ও পুণ্যকর্মকারীদের মাঝে খিলাফত প্রতিষ্ঠা করবেন। হাদীস হতেও এ বিষয়টি প্রমাণিত। অর্থাৎ উম্মতে মুহাম্মদীয়া যখন কুরআনের শিক্ষার ওপর সঠিকভাবে আমল করবে, তখন আল্লাহ্‌র এ অঙ্গীকার পূর্ণ হবে।

হযরত ইমাম মাহদী (আ.) বলেন,

"কিছু লোক **ওয়াদাল্লাহুল্লাযীনা আমানু মিনকুম ওয়া আমেলুস সালেহাতে লাইয়াস তাখলেফান্নাহুম ফিল আরযে কামাস্ তাখলাফাল্‌লাযীনা মিন কাবলিহিম"** এর বিষয়টিকে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। তারা 'মিনকুম' - তোমাদের মধ্য হতে–অনুবাদক)-এর অর্থ শুধু সাহাবাদের (রা.) নিয়ে থাকেন, এবং বলেন খেলাফত তাদের মাঝেই ও তাঁদের যুগেই শেষ হয়ে গেছে ও কিয়ামত পর্যন্ত খেলাফতের নাম-গন্ধ থাকবে না। এ কথার অর্থ হলো খিলাফত স্বপ্নের মত শুধু ত্রিশ বছর পর্যন্ত ছিল এবং এরপরে ইসলাম ক্রমাগত অধ:পতনের অশুভ গর্ভে নিপতিত হয়ে গেলো।"

"এগুলোকে নিয়ে যদি কেউ গভীরভাবে পর্যালোচনা করে তবে আমি কিভাবে বলতে পারি যে সে ব্যক্তি এ বিষয়টিকে বুঝতে পারে নি যে, এখানে খেলাফতের অঙ্গীকার স্থায়ীভাবে করা হয়েছে। এ খিলাফত যদি স্থায়ী না হয়ে থাকে তবে মূসা (আ.)-এর শরীয়তের খলীফাদের সাথে তুলনা দেবার কী প্রয়োজন ছিল?"

"যেহেতু মানুষের জন্য কোন স্থায়ীত্ব নেই তাই আল্লাহ্ তা'লা চেয়েছেন যে, মানুষের মাঝে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম সত্তার অধিকারী রসূলকে যিল্লী (প্রতিবিম্ব)-ভাবে কেয়ামত পর্যন্ত জীবিত রাখবেন। তাই এ উদ্দেশ্যে তিনি খিলাফত সৃষ্টি করেছেন, যাতে করে রেসালতের কল্যাণ হতে পৃথিবী যেন কখনও বঞ্চিত না হয়।

সুতরাং যে ব্যক্তি খিলাফতকে শুধু ত্রিশ পর্যন্ত মানে, সে মূর্খতাবশতঃ খিলাফতের মূল উদ্দেশ্যকে উপেক্ষা করে। খোদা তা'লার উদ্দেশ্য কখনও এটা ছিল না যে, রসূল করীম (সা.)-এর ওফাতের পর রেসালতের কল্যাণকে খলীফাদের সত্তায় ত্রিশ বছর পর্যন্ত বিদ্যমান রাখবেন আর এরপর পৃথিবী যদি ধ্বংস হয়ে যায় তবে কোন পরওয়া নেই" (শাহাদাতুল কুরআন পৃঃ ৩৪, পৃঃ ৫৮)।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের খেলাফতের রজ্জুকে ধরে এর আশীষ হতে কল্যাণমন্ডিত হবার তৌফিক দান করুন, আমীন।

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

‘আমি তোমার অনুবর্তী এই জামা’তকে কিয়ামত পর্যন্ত অন্যের ওপর প্রাধান্য দিব’

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

> খোদা তা’লা চাচ্ছেন যে, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত সকল সাধু-প্রকৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরকে, তারা ইউরোপেই বাস করুক বা এশিয়াতেই বাস করুক, তওহীদের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং তাঁর ভক্ত-দাসগণকে এক ধর্মে একত্রিত করেন। এটাই খোদা তা’লার অভিপ্রায়, আর এজন্যই আমি পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছি।

অতএব হে বন্ধুগণ! যেহেতু আদি কাল হইতে আল্লাহ্ তা’লার বিধান এটাই যে, তিনি দুইটি শক্তি প্রদর্শন করেন যেন বিরুদ্ধবাদীগণের দুইটি মিথ্যা উল্লাসকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে দেখান; সুতরাং এখন এটা সম্ভবপর নয় যে, খোদা তা’লা তাঁর চিরন্তন নিয়ম পরিহার করবেন। এজন্য আমি তোমাদেরকে যে কথা বলেছি তাতে তোমরা দুঃখিত ও চিন্তিত হয়ো না। তোমাদের চিত্ত যেন উৎকণ্ঠিত না হয়। কারণ তোমাদের জন্য দ্বিতীয় কুদরত দেখাও প্রয়োজন এবং এর আগমন তোমাদের জন্য শ্রেয় ঃ। কেননা, তা স্থায়ী, যার ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হবে না। সেই দ্বিতীয় কুদরত আমি না যাওয়া পর্যন্ত আসতে পারে না। কিন্তু যখন আমি চলে যাব, খোদা তখন তোমাদের জন্য সেই ‘দ্বিতীয় কুদরত’ প্রেরণ করবেন, যা চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকবে, যেহেতু বারাহীনে আহমদীয়া গ্রন্থে খোদার প্রতিশ্রুতি রয়েছে এবং সেই প্রতিশ্রুতি আমার নিজের সম্বন্ধে নয় বরং তা তোমাদের সম্বন্ধে। যেমন খোদা তা’লা বলেছেন ঃ

ম্যাঁয় ইস জামাতকো জো তেরে পায়রু হ্যাঁয় কিয়ামত তক দোসরো পর গালবা দুঙ্গগা

অর্থাৎ ‘আমি তোমার অনুবর্তী এই জামা’তকে কিয়ামত পর্যন্ত অন্যের ওপর প্রাধান্য দিব’ (অনূবাদক)। সুতরাং তোমাদের জন্য আমার বিচ্ছেদ দিবস উপস্থিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী, যেন ইহার পর সেই দিবস আগমন করে যাহা চিরস্থায়ী প্রতিশ্রুত- দিবস। আমাদের সেই খোদা প্রতিশ্রুতি পালনকারী, বিশ্বস্ত এবং সত্যবাদী খোদা। তিনি তোমাদিগকে সবকিছু দেখাবেন যা তিনি অঙ্গীকার করেছেন। যদিও বর্তমান যুগ পৃথিবীর শেষ যুগ এবং বহু বিপদাপদ রয়েছে, যা এখন অবতীর্ণ হবার সময়, তথাপি সেই সমুদয় বিষয় পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এই দুনিয়া অবশ্যই কায়েম থাকবে, যার সম্বন্ধে খোদা সংবাদ দিয়েছেন। আমি খোদার তরফ হতে এক প্রকার কুদরত হিসাবে আবির্ভূত হয়েছি। আমি খোদার মূর্তিমান কুদরত। আমার পর আরও কতিপয় ব্যক্তি হবেন, যাঁরা দ্বিতীয়- বিকাশ হবেন।

অতএব তোমরা খোদার **কুদরতে সানীয়ার** (দ্বিতীয় কুদরতের) অপেক্ষায় সমবেতভাবে দোয়া করতে থাক। প্রত্যেক দেশে সালেহীনের জামা’তের সমবেতভাবে দোয়ায় নিয়োজিত থাকা বাঞ্ছনীয়। যেন দ্বিতীয় কুদরত আসমান হতে অবতীর্ণ হয় এবং তোমাদেরকে এটাও দেখানো হয় যে, তোমাদের খোদা কত মহাপরাক্রমশালী। স্বীয় মৃত্যু সন্নিকটে জানবে, তোমরা জান না যে সেই মুহূর্ত কখন উপস্থিত হবে। জামা’তের পবিত্রচেতা বুযুর্গগণ আমার পরে আমার নামে লোকদের বয়আত (দীক্ষা) নিবে। ...খোদা তা’লা চাচ্ছেন যে, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত সকল সাধু-প্রকৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরকে, তারা ইউরোপেই বাস করুক বা এশিয়াতেই বাস করুক, তওহীদের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং তাঁর ভক্ত-দাসগণকে এক ধর্মে একত্রিত করেন। এটাই খোদা তা’লার অভিপ্রায়, আর এজন্যই আমি পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছি।

(আল ওসীয়্যত পুস্তক, সেপ্টেম্বর ১৯৯১সংস্করণ [বাংলায় অনুদিত] ঃ পৃঃ ১৫-১৭)

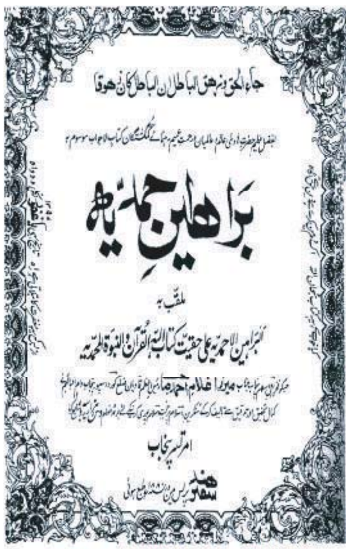

جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا

براهین احمدیه

ملقب به

البراهین الاحمدیه علی حقیقت کتاب الله القرآن والنبوة المحمدیه

امرتسر پنجاب

Facsimile of the original Urdu title page for Part I, printed in 1880.

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী

‘বারাহীনে আহ্‌মদীয়া’

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)
আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত-এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

(১৬তম কিস্তি)

ভারতের এ প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত দৃষ্টিপাত করে দেখ যত হিন্দু আছে সকলেই সৃষ্টিপূজায় নিমজ্জিত দেখা যাবে। কেউ মহাদেবজীর পূজারী, কেউ কৃষ্ণের গুণকীর্তনকারী আর কেউ মূর্তীর সামনে করজোড়ে প্রার্থনা করে। ইঞ্জিলের অবস্থাও তথৈবচ। কোন দেশ দেখা যায় না যেখানে ইঞ্জিলের মাধ্যমে একত্ত্ববাদের প্রসার ঘটে থাকবে। সত্য বলতে কী! ইঞ্জিলের মান্যকারী একত্ববাদীকে মুক্তিপ্রাপ্ত মনেই করে না বরং প্রাদ্রিরা একত্ববাদীদের অন্ধকার নরকের ইন্ধন আখ্যা দেয় যেখানে থাকবে কেবল রোদন ও দন্তপেষণ। তাদের কথা অনুসারে সেই অমানিশাপূর্ণ অগ্নি থেকে কেবল সে ব্যক্তিই মুক্তি পাবে, যে এই বিশ্বাসে অটল থাকে যে খোদা মৃত্যু, সমস্যা, ক্ষুৎ-পিপাসা ও ব্যথা-বেদনার শিকার আর সবসময় দৈহিকরূপ ধারণ করেন এবং কোন মানুষের বেসে আগমন করেন; এ বিশ্বাস না রাখলে পরিত্রাণের অন্য কোন উপায় থাকবে না। যেন সেই কাল্পনিক জান্নাত ইউরোপের দুই মহান জাতি অর্থাৎ ইংরেজ ও রাশিয়ানদের মাঝে অর্ধেক অর্ধেক করে ভাগ করে দেয়া হবে আর যারা খোদাকে তাঁর পরম পরাকাষ্ঠার পরিপন্থী ত্রুটি থেকে মুক্ত বিশ্বাস করতেন এমন সকল একত্ববাদী দোযখে যাবে।

এককথায় যার নাম তৌহীদ, আজ ধরাপৃষ্ঠে তা মুহাম্মদ (সা.)-এর উম্মত ছাড়া আর কোন ফিরকায় দেখা যায় না আর কুরআন ছাড়া অন্য কোন গ্রন্থের নাম-চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যায় না যা কোটি কোটি মানুষকে একত্ববাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত করে আর অলৌকীক ভাবে সেই পথ-প্রদর্শকের পানে পরিচালিত করে। প্রত্যেক জাতি স্ব-স্ব কৃত্রিম খোদা বানিয়ে নিয়েছে। কিন্তু মুসলমানদের খোদা তিনি যিনি আদি থেকে লয়-ক্ষয়ের উর্ধ্বে এবং অপরিবর্তিত আর নিজের চিরস্থায়ী বৈশিষ্ট্যে যেমন ছিলেন তেমনিই আছেন। এসকল ঘটনা এমন, যার মাধ্যমে ইসলামের হাদী বা মহানবী (সা.)-এর সত্যতা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যায়। কেননা নবুওয়তের অর্থ আর রিসালত ও পয়গম্বরীর উদ্দেশ্য তাঁর পবিত্র সত্তায় সত্য প্রমাণিত হচ্ছে।

যেভাবে শিল্প দেখে শিল্পীকে চেনা যায় অনুরূপভাবে বুদ্ধিমানরা বর্তমান সংস্কার

বা সংশোধন দেখে ঐশী সংস্কারক–কে? তা শনাক্ত করছে। অনুরূপভাবে সহস্র সহস্র এমন ঘটনা রয়েছে যার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, মহানবী ঐশী মদদপুষ্ট ছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ এটি কি বিস্ময়কর ঘটনা নয় যে, একজন বিত্ত ও শক্তিহীন নিরুপায়-নিরক্ষর এতীম আর নিঃসঙ্গ-দরিদ্র মানুষ সেসময় এমন সমুজ্জ্বল শিক্ষা নিয়ে এসেছেন যখন পৃথিবীর সকল জাতি আর্থিক, সামরিক ও জ্ঞানগত শক্তিতে ছিল সমধিক বলীয়ান আর তিনি স্বীয় অকাট্য প্রমাণ ও সুস্পষ্ট যুক্তির জোরে সবার মুখ বন্ধ করে দিয়েছেন। বড় বড় লোকদের স্পষ্ট ভ্রান্তি চিহ্নিত করেছেন যারা বিজ্ঞ সাজতো আর দার্শনিক আখ্যায়িত হতো। সহায়হীনতা ও দারিদ্র সত্ত্বেও সিংহাসন থেকে বাদশাহ্দের পতন ঘটানোর মত শক্তিমত্তা প্রদর্শন করেছেন আর সেসব সিংহাসনে দরিদ্রদের সমাসীন করেছেন–এটি খোদার সাহায্য নয়তো আর কি ছিল? ঐশী সাহায্য ছাড়াও কি

চলমান টিকা-

পৃথিবীর সকল জাতি সরল পথ, একত্ববাদ, নিষ্ঠা ও সততা বিসর্জন দিয়ে বসেছিল। এছাড়া কথা সবারই জানা যে, বর্তমান নৈরাজ্যের চিকিৎসাকারী এবং পৃথিবীকে শিরকের অন্ধকার ও সৃষ্টিপূজা থেকে বের করে একত্ববাদের ওপর প্রতিষ্ঠিতকারী কেবল মহানবী (সা.)-ই, অন্য কেউ নয়। সুতরাং এপূরো ভূমিকার ফলাফল যা দাঁড়ায় তাহলো, মহানবী (সা.) খোদার পক্ষ থেকে সত্যপথের দিশারী। এই যুক্তির প্রতি আল্লাহ্ তা'লা তাঁর পবিত্র বাণীতে নিজেই ইঙ্গিত করেছেন। আর তাহলো

تَاللّٰهِ لَقَدْ اَرْسَلْنَاۤ اِلٰۤى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٦٤﴾

وَمَاۤ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِى اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۙ وَهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٦٥﴾

وَاللّٰهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاۤءِ مَاۤءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ﴿٦٦﴾

(সূরা আন্ নাহ্ল)

অর্থাৎ, উপাস্য হিসেবে আমরা কসম খাচ্ছি, যিনি সঠিক পথ-প্রদর্শন ও লালন-পালন সংক্রান্ত সকল কল্যাণের উৎসস্থল আর যিনি সকল উৎকর্ষ গুণাবলীর সমাহার আর আমরাই তোমার পূর্বে পৃথিবীর বিভিন্ন ফিরকা ও জাতিতে বার্তাবাহক প্রেরণ করেছি। অতএব তারা শয়তানের প্রতারণায় বিভ্রান্ত হয়ে গেছে আর সেই শয়তানই আজ তাদের সকলের বন্ধু। এই গ্রন্থ অবতীর্ণ করার উদ্দেশ্য হলো, তাদের অভ্যন্তরীণ মতভেদ দূর করা এবং সত্যকথা তাদের স্পষ্টভাবে শোনানো। বাস্তবতা হলো, সারা পৃথিবী প্রাণশূন্য ছিল আর আল্লাহ্ তা'লা আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন এবং নতুনভাবে পৃথিবীকে সঞ্জীবিত করেছেন। এটি এ গ্রন্থের সত্যতার একটি নিদর্শন কিন্তু কেবল তাদের জন্য যারা শুনে অর্থাৎ যারা সত্য-সন্ধানী।

এখন মনোযোগ সহকারে দেখা উচিত যে, উপরোল্লিখিত সেই তিনটি প্রাথমিক যুক্তি যার মাধ্যমে আমরা মহানবী (সা.)-এর সত্য পথ-প্রদর্শক হওয়ার প্রমাণ দিয়েছি তা কত সুন্দরভাবে ও সূক্ষ্মতার সাথে উপরোক্ত আয়াতগুলোতে উল্লেখ রয়েছে। প্রধানতঃ ভ্রষ্টদের হৃদয়কে মৃত ও শুস্ক ভূমির সাথে তুলনা করে যা শতশত বছর ধরে ভ্রষ্টতায় নিপতিত ছিল, আর আকাশ থেকে আগত ঐশীবাণীকে বৃষ্টির পানি আখ্যা দিয়ে সেই আদি নিয়মের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যা ঐশী রহমত হিসেবে ভয়াবহ অনাবৃষ্টির যুগে চিরাচরিতভাবে আদম সন্তানকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে থাকে।

একথাও স্পষ্ট করেছেন যে, প্রকৃতির এই নিয়ম বা আল্লাহ্র এই রীত কেবল দৈহিক পানিতে সীমাবদ্ধ নয় বরং আধ্যাত্মিক পানিও কঠোর পরিস্থিতি বা কঠিন সময়ে অবশ্যই বর্ষিত হয় যা ভ্রষ্টতারই অপর নাম। এক্ষেত্রেও হৃদয়ের ব্যাধির আগ্রাসন প্রতিহত করার জন্য অবশ্যই ঐশী রহমত বর্ষিত হয়। এছাড়া এই আয়াতগুলোতে এই দ্বিতীয় কথাটিও বলেছেন যে, মহানবী (সা.)-এর আবির্ভাবের পূর্বে পুরো পৃথিবী ভ্রষ্টতায় নিপতিত ছিল। অনুরূপভাবে শেষের দিকে একথাও প্রকাশ করেছেন যে, এসকল আধ্যাত্মিক মৃতদের এই পবিত্র কালাম বা কুরআন জীবিত করেছে; এতে এ গ্রন্থের সত্যতার নিদর্শন রয়েছে। শেষের দিকে এ কথাটি বলে সত্য-সন্ধানীদের এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে যে, কুরআন মজীদ খোদার গ্রন্থ।

এই প্রমাণের ভিত্তিতে যেখানে হযরত খাতামুল আম্বিয়া (সা.)-এর সত্য নবী হওয়া প্রমাণিত হয় সেখানে এর মাধ্যমে তাঁর অন্য নবীদের মাঝে শ্রেষ্ঠ হওয়াও প্রমাণিত হয়। কেননা মহানবী (সা.)-কে সমগ্র বিশ্বের মুখোমুখি হতে হয়েছে। তাঁর ওপর যে কাজ ন্যস্ত হয়েছে তা অন্ততপক্ষে হাজার-দু'হাজার নবীর কাজ ছিল। কিন্তু খোদা যেহেতু আদম সন্তানদের একই জাতি ও অভিন্ন গোত্রে রূপ দিতে চেয়েছেন, আরো চেয়েছেন যে, অচেনা ও অপরিচিতির ভাব মুছে ও ঘুচে যাক, আর যেভাবে একের মাধ্যমে এ ধারা সূচিত হয়েছে অনুরূপভাবে একেই তা শেষ হোক; তাই তিনি শেষ হিদায়াতকে একযোগে সারা বিশ্বের জন্য প্রেরণ করেছেন।

এখন সে যুগ এসে গেছে যখন রাস্তা খুলে যাওয়া এবং এক জাতির অন্য জাতির সাথে এবং এক দেশের অন্য দেশের সাথে শ্রেণীগত ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ধারা সূচিত হয়ে গিয়েছিল আর স্থায়ী মেলামেশার কল্যাণে এক দেশ অন্য দেশের ওপর প্রভাব বিস্তার আরম্ভ করে। এ ধারা এখনও অব্যাহত আছে। সমস্ত উপকরণ, যেমন রেল, তার, জাহাজ ইত্যাদি প্রতিনিয়ত এমনভাবে আবিস্কৃত হচ্ছে যা দেখে এটিই বুঝা যায় যে, সর্বশক্তিমান, সারা বিশ্বকে একদিন এক অভিন্ন জাতি-সত্তায় পরিণত করতে চান। যাইহোক, পূর্বের নবীদের চেষ্টা ছিল সীমিত কেননা তাঁদের রিসালত এক জাতির মাঝেই

(চলমান টিকা)

সারা পৃথিবীর ওপর বুদ্ধি, জ্ঞান, শক্তি ও ক্ষমতার জোরে জয়যুক্ত হওয়া যায়?

ভাবা উচিত, প্রথম দিকে যখন মহানবী (সা.) মক্কাবাসীদের মাঝে ঘোষণা দিলেন যে, আমি নবী, তখন তাঁর সাথে কে ছিল? কোন্ বাদশাহ্‌র ধনভান্ডার তাঁর নিয়ন্ত্রণে ছিল যার ভরসায় সারা পৃথিবীর মুখোমুখী হওয়ার ঝুঁকি নিলেন? অথবা এমন কোন্ সেনাবাহিনী গঠন করেছিলেন যার ভরসায় সকল বাদশাহ্‌র আক্রমণ হতে নিরাপদ হয়ে গেলেন? আমাদের বিরোধীরাও জানে, তখন ভূপৃষ্ঠে মহানবী (সা.) নিঃসঙ্গ ও সহায়- সম্বলহীন ছিলেন। তাঁর সাথে ছিলেন কেবল এক খোদা, যিনি তাঁকে এক মহান উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছিলেন। আবার এদিকেও দেখা উচিত যে, তিনি কোন্ মক্তবে পড়ে ছিলেন আর কোন্ স্কুল থেকে পাশ করেছিলেন? এছাড়া তিনি কখন ইহুদী, খৃষ্টান, আর্য তথা পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মের পবিত্র গ্রন্থাবলী পাঠ করলেন?

(চলবে)

ভাষান্তর: **মওলানা ফিরোজ আলম**
মুরব্বী সিলসিলাহ্

সীমাবদ্ধ ছিল আর মহানবীর চেষ্টা ছিল সীমাহীন ও ব্যাপক; কেননা তাঁর রিসালত ছিল সার্বজনীন। কুরআন শরীফে যে পৃথিবীর সকল মিথ্যা ধর্মের খন্ডন রয়েছে তার এটিই কারণ। ইঞ্জিলে কেবল ইহুদীদের নোংরা চালচলনের কথা রয়েছে।

অতএব মহানবী (সা.)-এর সকল নবীর মাঝে শ্রেষ্ঠ হওয়া এমন কার্যাবলীর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যা সকল গন্ডি ও সীমাকে ছাড়িয়ে গেছে। এছাড়া একথাও দিবালোকের মত স্পষ্ট যে, শির্‌ক ও সৃষ্টি-পূজা বন্ধ করা আর একত্ববাদ ও খোদার প্রভাব-প্রতাপ হৃদয়ে গ্রথিত করা সবচেয়ে বড় পুণ্য ও মহান কাজ।

এই পুণ্য মহানবীর পক্ষ থেকে যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে অন্য কারো পক্ষ থেকে সেভাবে প্রকাশ পায়নি– একথা কি কেউ অস্বীকার করতে পারে? আজকে পৃথিবীতে কুরআন মজীদ ছাড়া এমন কোন্ গ্রন্থ আছে যা কোটি কোটি মানুষকে একত্ববাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছে? আর এটিও জানা কথা যে, যার হাতে সবচেয়ে বড় সংস্কার হয়েছে তিনিই শ্রেষ্ঠ।

মিজানুল হকের রচয়িতা পাদ্রি ফান্ডর সাহেব লেখেন যে, যখন ইসলাম ধর্ম পৃথিবীতে এসেছিল সে যুগে খৃষ্টানরা চরম বিদাতে লিপ্ত ছিল আর ইঞ্জিলের শিক্ষা মেনে চলাম দৃষ্টান্ত তাদের জীবন হতে ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছিল। এরপর আমাদের নবী (সা.)-এর কথা উল্লেখ করে লেখেন, খোদা যে তাঁকে ধর্ম-প্রচারে বাঁধা দেননি এর এটিই কারণ ছিল। কেননা তখন খোদা তা'লা খৃষ্টানদের সাবধান করা ও শাস্তি দেয়ার মনস্থ করেছেন যারা ইঞ্জিলকে আমলেই নিত না।

এখন পাদ্রি সাহেবের সততা, ন্যায়নিষ্ঠা ও ঈমানদারী দেখুন! কথা টেনে-হেচড়ে কোথা থেকে কোথায় নিয়ে গেছেন। নিজের খৃষ্টান ভাইদের ওপর আল্লাহ্‌র কহর বা শাস্তি বর্ষণ করিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু মহানবীর সত্যতা গ্রহণ করা তার ধাতে সয়নি (ভাগ্যে জোটেনি)। ....পরিতাপ! এমন বিদ্বেষ প্রসূত ধারণা প্রকাশ করতে পাদ্রি সাহেবের একটুও খোদার ভয় হলো না। নতুবা এটি জানা কথা যে, খোদা তা'লা সম্পর্কে এমন কথা মুখে আনা ঘৃণ্য কুফরী, চরম ধৃষ্টতা এবং হঠকারিতা বৈকী যে, তিনি বিশ্ববাসীদের পথভ্রষ্ট ও ভ্রান্তিতে নিপতিত দেখে তাদের জন্য এমন ব্যবস্থা হাতে নেন যার ফলে তারা অধিক ভ্রষ্টতায় নিপতিত হয়! এটি পাদ্রি সাহেবানদেরই পরম সততা ও ধার্মিকতা যে, মহানবী (সা.)-এর বিরোধিতার জন্য খোদা তা'লাকেও হাদী বৈশিষ্ট্য হতে অব্যহতি প্রদান করেন। ভ্রষ্টতা ও অবিশ্বাস যখন চরমে আর মানুষ যখন আপাদমস্তক শির্‌ক ও সৃষ্টিপূজায় নিমজ্জিত, তখন পাদ্রি সাহেবের কথা অনুসারে আল্লাহ্‌র এই পরিকল্পনাই মাথায় এসেছে আর এই চিকিৎসাই তাঁর পছন্দীয় হলো!– এমন বিবেকবান ও ঈমানদার কে হবে যে খোদার প্রতি এ কাজ আরোপ করতে পারে?

যা পাদ্রি সাহেবের উক্তি অনুসারে সৃষ্টিকে অধিক শোচনীয় অবস্থার মুখে ঠেলে দেবে। সংস্কারক সৃষ্টি না করে এমন এক ব্যক্তিকে সৃষ্টির ওপর চাপানো যা পাদ্রিদের দাবি অনুসারে অবশিষ্ট নামসর্বস্ব পুণ্য ও সততা অর্থাৎ খোদাকে রক্তে ও নোংরা স্থানে প্রবেশ করা হতে পবিত্র জ্ঞান করা এবং জন্ম-মৃত্যু ও দুঃখ-বেদনার ঊর্ধ্বে হওয়ার ধারণাকেও বিলুপ্ত করবে। কারো চিন্তার জগতে এমন ধারণার উদয় হতে পারে কি, বা কোন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির হৃদয় এই ফতোয়া দেবে কি যে, দয়ালু ও কৃপালু খোদার অভ্যাস এমনই? তিনি পৃথিবীকে ভ্রষ্টতায় নিপতিত দেখে তাদের জন্য সেব্যবস্থা করবেন যা তাদের পূর্বের চেয়ে শত-শতগুণ বেশি ভ্রষ্টতার মাঝে ঠেলে দেবে? কোন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির জন্য একথা বোঝা কঠিন কিছু নয় যে, পৃথিবীতে সর্বগ্রাসী নৈরাজ্যের বিস্তার একজন সংস্কারকের দাবি রাখে। সকল বিবেকবানের স্পষ্টতই চোখে পড়ে, অজ্ঞতা ও ভ্রষ্টতার প্রাধান্যের যুগে খোদার পথ-প্রদর্শনের বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির জন্য প্রকাশিত হওয়া উচিত। কিন্তু যে ব্যক্তি বিদ্বেষের কারণে অন্ধ হয়ে যায় তার জন্য দেখা কি করে সম্ভব হতে পারে? অন্ধ কখনও কিছু দেখেছে কি– যে সেও দেখবে? পরিতাপ পাদ্রিরা এমন সব হঠধর্মিতা প্রদর্শন করতে গিয়ে শাস্তি ও পুরস্কার দিবসকেও ভয় করে না; আর করবেই বা কেন? ঈসার প্রায়শ্চিত্বের ওপর যে তারা নির্ভর করে। নতুবা বিবেক একথা মানতেই পারে না যে পাদ্রিদের বোধবুদ্ধি এত দুর্বল হবে আর আজ পর্যন্ত খোদার চিরন্তন নিয়ম সম্পর্কে তারা অনবহিত থাকবে। সেই খোদা যিনি মূসার সময় একজাতিকে উদাসীন এবং অত্যাচারীদের কবলে নিপতিত দেখে স্বীয় বার্তাবাহক পাঠিয়েছেন আর পুনরায় হযরত ঈসার সময় ইহুদীদেরকে সামান্য বদভ্যাসে লিপ্ত পেয়ে তড়িঘড়ি হযরত ঈসাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন; তিনি শেষ যুগে এত পাষাণ ও নিষ্ঠুর হয়ে গেলেন যে, সারা পৃথিবী শির্‌ক ও সৃষ্টিপূজায় তলিয়ে গেল কিন্তু হিদায়তের ব্যবস্থা করার কথা তাঁর মাথায়ও এলোনা বরং বিভ্রান্তদের আরো সর্বনাশের দিকে ঠেলে দেয়া আরম্ভ করেন যেন প্রথম যুগে এমন ভ্রষ্টতা তাঁর ঘৃণ্য মনে হতো কিন্তু এখন ভালো লাগে।

–লেখক

ইবাদতের প্রাণ নামায

জুমুআর খুতবা

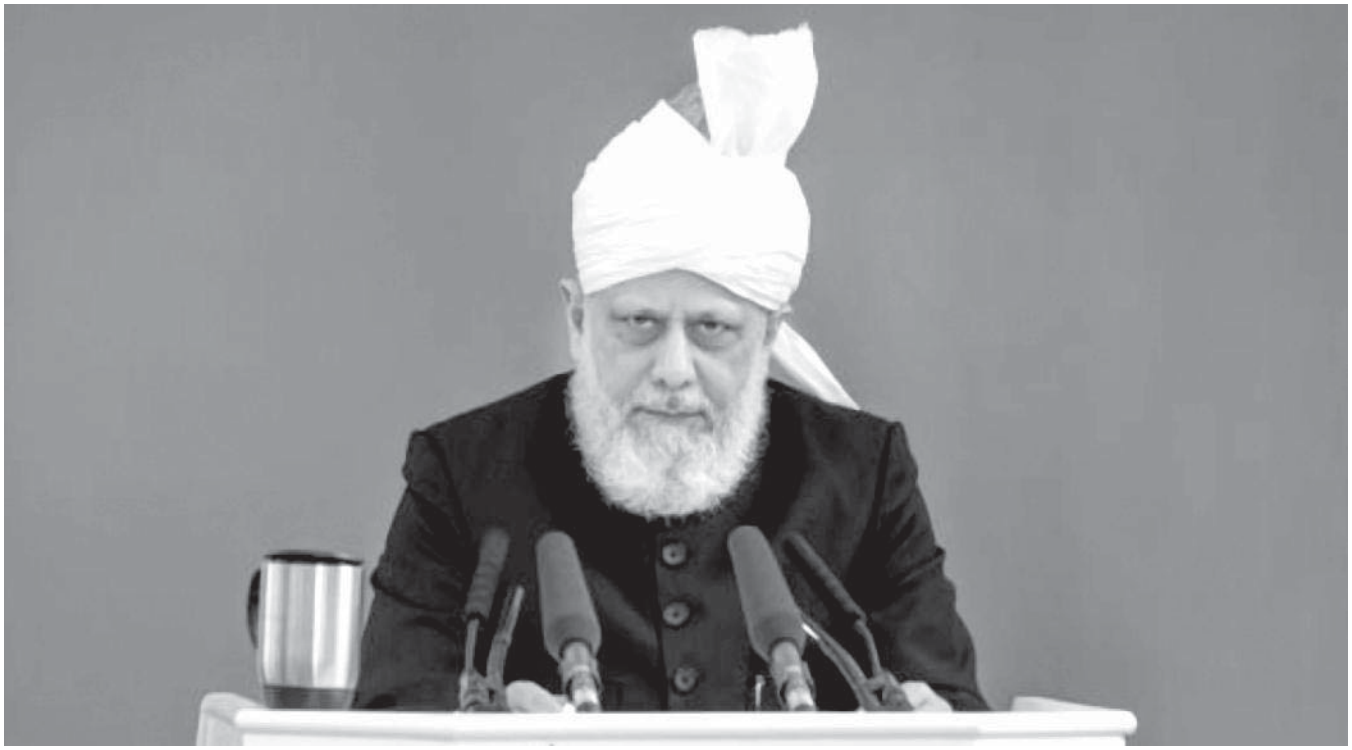

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৫ এপ্রিল, ২০১৬ তারিখের জুমুআর খুতবা

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝۱ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝۲ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝۳ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝۴ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝۵
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝۶ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝۷

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, কুরআন পবিত্র কুরআনে নামায পড়ার প্রতি বেশ কয়েক স্থানে মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে। কোথাও নামাযের হিফাযত বা সুরক্ষার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, কোথাও নিয়মিত নামায পড়ার নির্দেশ রয়েছে আবার কোন স্থানে সময়মত নামায পড়ার নির্দেশ রয়েছে, আর এর জন্য নির্দিষ্ট সময়েরও উল্লেখ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, এই হলো নামাযের সময় যা একজন মু'মিনকে মেনে চলার বিষয়ে যত্নবান হওয়া উচিত। এক কথায় নামায কায়েম এবং নামাযের আবশ্যকতা সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বারবার একজন মু'মিনকে নসীহত করেছেন। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা যা বলেছেন তাহলো মানব সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যই হলো ইবাদত।

যেমন তিনি বলেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ۝۵۷

(সূরা আয্-যারিয়াত: ৫৭)অর্থাৎ জ্বিন এবং মানব সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যই হলো ইবাদত করা। কিন্তু মানুষ এই উদ্দেশ্যকে অনুধাবন করে না এবং এটি থেকে দূরে পড়ে আছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন,

"আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য যা নির্ধারণ করেছেন তাহলো তোমরা খোদার ইবাদত কর। কিন্তু যারা এই মৌলিক ও প্রকৃতিগত উদ্দেশ্যকে বিসর্জন দিয়ে পশুর মত কেবলপানাহার এবং নিদ্রাকে জীবনের উদ্দেশ্য মনে করে তারা খোদার কৃপা থেকে বঞ্চিত হয় এবং

খোদার ওপর তাদের আর কোন দায়-দায়িত্ব থাকে না।” অতএব বিশ্বাস বা ঈমানের দাবীদার একব্যক্তিকে পুরো চেষ্টা এবং গভীর মনোযোগ দিয়ে এই লক্ষ্য অর্জনে ব্রতী হওয়া উচিত যেন সে খোদার কৃপারাজির উত্তরাধিকারী হতে পারে, খোদার কৃপাবারি লাভ করতে পারে। আর ইবাদতের এই উদ্দেশ্য কীভাবে সাধিত হতে পারে? এর জন্য ইসলাম আমাদেরকে পাঁচবেলা নামায পড়ার নির্দেশ দিয়েছে। এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, “ইবাদতের প্রাণ হলো নামায”। অতএব এই লক্ষ্য অর্জন করার মাধ্যমেই আমরা ইবাদতের উদ্দেশ্য সাধন করতে পারি। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, আমরা এ যুগের ইমামকে গ্রহণ করেছি বা মেনেছি, যিনি আমাদেরকে ইবাদতের সঠিক রীতি-পদ্ধতি শিখিয়েছেন, ইবাদতের সত্যিকার প্রজ্ঞা এবং উদ্দেশ্য শিখিয়েছেন, আমাদেরকে এটিও শিখিয়েছেন যে, ইবাদতের মূল উদ্দেশ্য কি। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থানে তিনি বারংবার নামাযের প্রতি নিজ জামা'তের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং এর বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেছেন, এর খুঁটিনাটি ব্যাখ্যা করেছেন, এর উদ্দেশ্য, প্রজ্ঞা এবং প্রয়োজনিয়তা স্পষ্ট করেছেন, যেন আমরা নামাযের গুরুত্ব অনুধাবন করে সুন্দরভাবে ও সুচারুরূপে নামায পড়তে পারি।

এখন আমি এই প্রেক্ষাপটে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কয়েকটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করব। অনেক সময় চরমভাবাপন্ন আবহাওয়ার কারণে বা রাত অতি সংক্ষিপ্ত বা স্বল্প দৈর্ঘ হওয়ার কারণে ফজরের নামাযের বেলায় আলস্য হয়ে যায়। সচরাচর যোহর আসরের নামায মানুষ হয়তো জমা করে বা অনেককে আমি দেখেছি যারা কাজের চাপের কারণে নামাযই পড়ে না। অতএব চরমভাবাপন্ন আবহাওয়া হোক বা রাতের ঘুম পূর্ণ না হোক বা কাজের ব্যস্ততাই হোক না কেন এসব কারণে মানুষ হয়তো নামায ছেড়ে দেয় বা অনেকেই এমনও আছে যারা বলে, আমরা তিন বেলার নামায জমা করি বা করেছি।

আজকাল এসব দেশে খুব দ্রুত নামাযের সময় এগিয়ে আসছে। পূর্বের চেয়ে এখন ফজরের নামাযে এক বা দেড় সারি কমে গেছে বা কমতে আরম্ভ করেছে। কিছু মানুষ যারা বাহির থেকে এসেছে বা আসে তাদের কারণে হয়তো কখনও কখনও সংখ্যা বেড়ে যায় কিন্তু স্থানীয়দের এ বিষয়ে মনোযোগ দেয়া উচিত, অর্থাৎ যারা মসজিদের আশেপাশে বসবাস করেন বা যাদের হালকা এটি (তাদের)। আপনারা রীতিমত আপনাদের মসজিদে বা নামায সেন্টারে নামাযের জন্য যাবেন, বিশেষ করে ফজরের নামায পড়ার জন্য। শুধু এখানেই নয় বরং বিশ্বের সব দেশেই মসজিদ আবাদ করার চেষ্টা থাকা চাই। বিশেষ করে ওহদাদার এবং জামাতের কর্মকর্তা-কর্মচারী আর ওয়াকফে যিন্দেগীগণ যদি এর প্রতি মনোযোগী হয় তাহলে নামাযে উপস্থিতি অনেক বৃদ্ধি পেতে পারে। রীতিমত এবং যথাযথভাবে নামায পড়া এবং নামায কায়েম করা সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এক বৈঠকে বলেন,

“নামায রীতিমত আবশ্যকীয় দায়িত্ব হিসেবে কায়েম কর। অনেকেই শুধু এক বেলার নামায পড়ে। স্মরণ রাখা উচিত, নামায থেকে ছুটি পাওয়া যায় না বা নামায মাফ হয় না, এমনকি নবীদের নামাযওমাফ করা হয়নি। এক হাদীসে এসেছে, একটি নতুন জামাত মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে এবলে নিজেদের নামায মাফ করাতে চেয়েছিল যে, আমাদের ব্যস্ততা আছে, কাজের চাপ অনেক বেশি তাই আমাদের নামায মাফ করা হোক। তিনি (সা.) বলেন, যে ধর্ম আমল বা কর্ম-শূন্য সেটি কোন ধর্মই নয়। তাই এ কথা ভালোভাবে স্মরণ রাখ এবং নিজেদের আমল বা কর্মকে আল্লাহ্ তা'লার শিক্ষা বা নির্দেশের অধিনস্ত কর। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর মাঝে এটিও একটি নিদর্শন যে, আকাশ এবং পৃথিবী তাঁর নির্দেশেই নিজ নিজ জায়গায় বিদ্যমান।

প্রকৃতিবাদী স্বভাবের মানুষরা অনেক সময় বলে, প্রকৃতি পূজারী ধর্মই অনুসরণের যোগ্য কেননা; স্বাস্থ্যসংক্রান্ত নীতিসমূহ যদি অনুসরণ না করা হয় তাহলে তাক্বওয়া এবং পবিত্রতা অর্জনে কী লাভ? বস্তুবাদী মানুষ বলে, থাকে যে, জাগতিক এবং প্রাকৃতিক অনেক নিয়ম-নীতি রয়েছে, সেগুলো অনুসরণ করা উচিত। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত বিভিন্ন নীতি আছে যে, এই এই জিনিসগুলো মেনে চলতে হবে, এগুলো যদি মেনে না চল , যদি স্বাস্থ্য বজায় না থাকে, তাক্বওয়া এবং পবিত্রতাও বজায় থাকতে পারে না। সুতরাং এমন তাক্বওয়া এবং পবিত্রতা থেকে লাভ কী?

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, স্মরণ রাখা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লার নিদর্শনাবলীর একটি হলো, অনেক সময় ঔষধ অকার্যকর হয়ে যায় আর স্বাস্থ্য রক্ষা-সংক্রান্ত নীতিগুলোও কোন কাজে আসে না। ঔষধও কাজে আসে না আর দক্ষ চিকিৎসকও কাজে আসে না, কিন্তু যদি খোদার নির্দেশ আসে তাহলে অগোছালো বিষয়ও সুবিন্যস্ত হয়ে যায়।”

অতএব আসল বিষয় হলো খোদার কৃপা। মানুষের এই ধারণা ভুল যে, স্বাস্থ্যই সব কিছু বা অমুক অমুক কাজ করলে স্বাস্থ্য ভালো থাকবে, অসুস্থতার সময় অমুক ঔষধ খেলেই স্বাস্থ্য ভালো হয়ে যাবে। এসব কিছু খোদার নির্দেশের অধীনে কাজ করে আর আল্লাহ্র ইচ্ছা যদি না থাকে তাহলে সবকিছু বৃথা। অতএব যার ইচ্ছা এবং নির্দেশে সবকিছু চলছে তাঁর সামনে আমাদের বিনত হতে হবে এবং তাঁরই ইবাদত করতে হবে, তাঁর সাথেই সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। কাজেই নামায যেখানে সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আবশ্যক সেখানে তা বিপদাপদ এবং সমস্যা থেকেও আমাদের সুরক্ষা করে। আমাদের অনেক কাজ এমন আছে যা বাহ্যতঃ অসম্ভব মনে হয়, কিন্তু খোদার দরবারে সমর্পিত হলে এবং খোদার সাথে সম্পর্কের কারণে তা সম্ভব হয়ে উঠে। অতএব যা কিছু সাধিত হয় খোদার ইচ্ছা অনুসারেই হয়। সে কারণেই খোদার কৃপাধন্য হওয়ার বেশি বেশি চেষ্টা করা উচিত।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন, “আসল কথা হলো আল্লাহ্ তা'লা যা চান তাই করেন। তিনি বিরান ভূমিকে আবাদ করেন আবার আবাদ ভূমিকে বিরান ভূমিতে পরিণত করেন। দেখ! বাবেল শহরের সাথে তিনি কি ব্যবহার করেছেন। মানুষ যেই জায়গা আবাদ করার পরিকল্পনা করেছিল আল্লাহ্র ইচ্ছায় তা বিরান ভূমিতে পরিণত হয়েছে এবং পেঁচার বসতিস্থলে হয়ে যায় আর যেই জায়গা সম্পর্কে মানুষ

চাইত যে, তা বিরান ভূমিতে পরিণত হোক তা পৃথিবীর সমগ্র মানব মন্ডলীর প্রত্যাবর্তন স্থল বা বার বার ফিরে আসার জায়গায় পরিণত হয়েছে অর্থাৎ মক্কা নগরী।

তাই স্মরণ রেখ! আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে ঔষধ এবং পরিকল্পনার ওপর নির্ভর করা চরম নির্বুদ্ধিতা। নিজেদের জীবনে এমন পরিবর্তন আনয়ন কর যেন তা এক নতুন জীবন রূপে প্রতিভাত হয়। অজস্র ধারায় ইস্তেগফার কর। যাদের জাগতিক কাজ-কর্মের আধিক্যের কারণে সময় কম থাকে তাদের সবচেয়ে বেশি ভয় করা উচিত। যারা মনে করে, আমাদের জাগতিক ব্যস্ততা অনেক, জাগতিক কাজ-কর্ম আমাদের অনেক বেশি, ইবাদত এবং নামায পড়ার সুযোগ আমাদের নেই, তাদের সবচেয়ে বেশি ভয় করা উচিত। চাকরিজীবিদের ক্ষেত্রে আল্লাহ্-কর্তৃক নির্ধারিত আবশ্যকীয় দায়িত্ব অধিকাংশ সময় বাদ পড়ে যায়। তাই বাধ্য-বাধকতার ক্ষেত্রে যোহর-আসর এবং মাগরিব-ইশার নামায জমা করে পড়া বৈধ। আমি এটিও জানি শাসকের কাছে বা কর্মকর্তার কাছে যদি নামাযের অনুমতি চাওয়া হয় তাহলে তারা অনুমতি দেয়। মানুষ যেখানে চাকরি করে সেখানে কর্মকর্তাদের ওপর যদি তাদের ভালো প্রভাব থাকে তাহলে নামাযের অনুমতি চাইলে তারা নামাযের অনুমতি দিয়ে দেয়। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের পক্ষ থেকে নিম্নপদস্থ কর্মকর্তাদের এজন্য বিশেষ দিক-নির্দেশনাও দেয়া থাকে। অনেক সময় এমন নির্দেশ সত্যিই দেয়া হয়ে থাকে। তিনি (আ.) বলেন, "নামায পরিত্যাগের প্রেক্ষাপটে এমন অযথা টালবাহানা আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। আল্লাহ্ এবং বান্দার অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে অন্যায় এবং সীমালঙ্ঘন করো না। পরম সততার সাথে নিজেদের ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন কর।"

শুধু নামাযই নয় বরং তিনি আমাদের কাছে এর চেয়েও বড় প্রত্যাশা রাখেন। নামায এবং তাহাজ্জুদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন,

"এই পুরো জীবনকাল যদি জাগতিক কাজকর্মেই কেটে যায় তাহলে পরকালের জন্য কি সঞ্চয় করলে? যদি জীবনের পুরো সময়, প্রতিটি নিঃশ্বাস, প্রতিটি মুহূর্ত মানুষ জাগতিক আয়-উপার্জনেই ব্যয় করে তাহলে পরকালের জন্য সে কি সঞ্চয় করলো? তিনি (আ.) বলেন, বিশেষ সচেতনতার সাথে তাহাজ্জুদের জন্যও উঠো আর সুগভীর একাগ্রতা ও আগ্রহের সাথে তা পড়। মধ্যবর্তী নামাযগুলোতে চাকরির কারণে পরীক্ষা এসে যায়। আল্লাহ্ তা'লাই প্রকৃত জীবিকা বিধায়ক।" তাই নামায যথাসময় পড়া উচিত। কোন কোন সময় যোহর-আসরের নামায জমা হতে পারে। আল্লাহ্ তা'লা জানেন, মানুষ দুর্বলই হবে, তাই তিনি এই ছাড় দিয়েছেন। কিন্তু এই ছাড় তিন বেলার নামায জমা করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যেখানে চাকরী এবং অন্যান্য অনেক বিষয়ে মানুষ শাস্তি পায় আর সরকার বা কর্মকর্তাদের ক্রোধভাজন হয় সেখানে খোদার খাতিরে কোন কষ্ট সহ্য করা কতইনা প্রশংসনীয় বিষয়। জাগতিক চাকরীতে কাজকর্মের ক্ষেত্রেও মানুষ শাস্তি পেয়ে থাকে, আবার অনেক সময় কষ্টও সহ্য করে। তাই নামায পড়ার জন্য বা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য যদি কিছুটা কষ্ট করতে হয় তাহলে এটি তো আগাগোড়াই কল্যাণ।

অতএব একজন মু'মিনের সর্বদা এটি স্মরণ রাখা উচিত। এখন রাত ছোট হয়ে আসছে। তাই এই ছোট রাত নামায কাযা করার কারণ যেন না হয় বা সম্পূর্ণভাবে নামায ছেড়ে দেয়ার কারণ যেন না হয় আর জাগতিক কর্ম ব্যস্ততাও যেন নামাযের পথে বাধ সাধতে না পারে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের সব সময় আত্মজিজ্ঞাসায় রত থাকা উচিত। আমাদের অনেকে আবশ্যকীয় দায়িত্ব হিসেবে নামায পড়ে থাকে ঠিকই, কিন্তু এর প্রকৃত অর্থ এবং মর্ম তারা বুঝে না। এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এক জায়গায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন যে, "নামায কী? এটি একটি বিশেষ দোয়া। কিন্তু মানুষ নামাযকে বাদশাহ্‌দের কর মনে করে, যেন বাধ্য হয়ে পরিশাধ করছে, যেন তাদের ওপর কর চাপানো হয়েছে। নির্বোধ এতটাও জানে না যে, আল্লাহ্ তা'লার এসব কিছুর প্রয়োজন কী? তাঁর ব্যক্তিগত আত্মাভিমান এর মুখাপেক্ষী নয় যে, মানুষ দোয়া করবে এবং আল্লাহ্ তা'লার পবিত্রতা ও আল্লাহ্ তা'লার একত্ববাদের ঘোষণা করবে। এতে মানুষের জন্যই কল্যাণ নিহিত অর্থাৎ সে এভাবে তার লক্ষ্যে এবং গন্তব্যে পৌঁছে যায়।

তিনি (আ.) বলেন, "এটি দেখে আমার খুবই আক্ষেপ হয় যে, আজকাল ইবাদত, তাক্বওয়া এবং ধর্মকর্মের প্রতি ভালোবাসা নেই। কু-প্রথার একটি সার্বজনীন বিষক্রিয়াই হলো এর মূল কারণ। একারণেই খোদার ভালোবাসা উবে যাচ্ছে আর ইবাদতে যে ধরণের স্বাদ পাওয়া উচিত মানুষ সেই স্বাদ পায় না। এই পৃথিবীতে এমন কোন বস্তু নেই যাতে আল্লাহ্ তা'লা স্বাদ এবং এক প্রকার বিশেষ আনন্দ রাখেন নি।যেভাবে একজন রোগী পরম উৎকৃষ্ট সুস্বাদু খাদ্যেরও স্বাদ পায় না এবং সেটিকে তিক্ত ও বিস্বাদ মনে করে, অনেক সময় অসুস্থতার কারণে মুখের স্বাদ নষ্টহয়ে যায়, অনুরূপভাবে যারা আল্লাহ্‌র ইবাদতে আনন্দ বা স্বাদ পায় নাতাদের নিজেদের রোগ সম্পর্কে চিন্তিত হওয়া উচিত।

যেমনটি আমি এখনই বলেছি যে, এ পৃথিবীতে এমন কোন বস্তু নেই যাতে আল্লাহ্ তা'লা কোন না কোন স্বাদ অন্তর্নিহিত রাখেন নি। আল্লাহ্ তা'লা মানব জাতিকে ইবাদতের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন, তাই কী কারণ থাকতে পারে যে, এই ইবাদতে তার জন্য কোন আনন্দ এবং স্বাদ অন্তর্নিহিত থাকবে না? একদিকে তিনি বলছেন, আমি সৃষ্টিই করেছি ইবাদতের জন্য অথচ ইবাদতে কোন স্বাদ বা আনন্দ রাখবেন না?

তিনি (আ.) বলেন, "আনন্দ এবং স্বাদ অবশ্যই অন্তর্নিহিত আছে কিন্তু সেটিকে উপভোগ করার মানুষও তো চাই, সেই স্বাদ অর্জনের চেষ্টা করাও প্রয়োজন। আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

وَمَا خَلَقۡتُ الۡجِنَّ وَالۡاِنۡسَ اِلَّا لِيَعۡبُدُوۡنِ ﴿٥٧﴾

(সূরা আয্-যারিয়াত: ৫৭) এখন মানুষ যেখানে সৃষ্টিই হয়েছে ইবাদতের জন্য তাই ইবাদতে পরম মার্গের স্বাদ এবং আনন্দও অন্তর্নিহিত রাখা আবশ্যক। আমরা দৈনন্দিন জীবনের পর্যবেক্ষণ এবং অভিজ্ঞতার আলোকে একথা খুব

ভালোভাবে বুঝতে পারি। সব কাজেই আল্লাহ্ তা’লা আনন্দ এবং সুখ অন্তর্নিহিত রেখেছেন তা দৈনন্দিন কাজের মাধ্যমে বোঝা যায় বা অভিজ্ঞতা হয়।

তিনি (আ.) বলেন, “দেখ! খাদ্য শস্য ও সকল খাদ্য-পানীয় যা মানুষের জন্য সৃষ্টি হয়েছে এগুলো কি সে উপভোগ করে না, সে কি এর স্বাদ পায় না? বরং সুস্বাদু খাবার যদি রান্না করা হয় তাহলে মানুষ পরম আনন্দ পায়। এই আনন্দ এবং স্বাদকে উপভোগ করার জন্য তার মুখে কি জিহ্বা নেই? সুন্দর জিনিস দেখে, উদ্ভিদ হোক বা জড় বস্তু হোক, মানুষ হোক বা পশু, সে কি আনন্দ পায় না? অতএব সে খাবারের স্বাদও পায় আর সৌন্দর্যের স্বাদও চোখের মাধ্যমে উপভোগ করে। মনভোলা এবং সুললিত কণ্ঠ কি তার কান উপভোগ করে না? আল্লাহ্ তা’লা কান সৃষ্টি করেছেন, সুন্দর সুর বা সুন্দর আওয়াজ কানে পড়লে হৃদয় আনন্দিত হয়। অতএব এই বিষয়টি বোঝার জন্য কি আরও প্রমাণ প্রয়োজন যে, ইবাদতে স্বাদ অন্তর্নিহিত আছে। এসব জিনিস যা আল্লাহ্ তা’লা সৃষ্টি করেছেন যাতে মানুষ স্বাদ এবং আনন্দ পায় কিন্তু ইবাদতে স্বাদ থাকবে না এটি কীভাবে সম্ভব। এ সবকিছু এ কথার প্রমাণ যে, ইবাদতেও আল্লাহ্ তা’লা আনন্দ এবং স্বাদ অন্তর্নিহিত রেখেছেন।

তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা’লা বলেন, আমি নর ও নারীকে জোড়া বা জুটি করে সৃষ্টি করেছি এবং পুরুষের মাঝে এর প্রতি আকর্ষণ রেখেছি। এখন এতে কেবল বাধ্য বাধকতাই নয় বরং আনন্দও রেখেছেন। যদি শুধু বংশ বিস্তারই মূল উদ্দেশ্য হতো তাহলে লক্ষ্য অর্জিত হতো না।আল্লাহ্ তা’লার চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হলো মানব সৃষ্টি। আর এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য নর ও নারীর মাঝে তিনি একটি সম্পর্ক সৃষ্টি করেছেন আর প্রসঙ্গত তাতে এক ধরনের স্বাদ ও আনন্দ অন্তর্নিহিত রেখেছেন। কিন্তু অধিকাংশ নির্বোধের দৃষ্টিতে এটিই মূল উদ্দেশ্য। কিছু দুনিয়ার কীট এবং নির্বোধ মনে করে, আমাদের মূল উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য এটিই।

তিনি (আ.) বলেন, একইভাবে এই বিষয়টিও ভালোভাবে বুঝে নাও যে, ইবাদত কোন বোঝা বা কর নয়, এতেও একটি স্বাদ এবং আনন্দ অন্তর্নিহিত আছে। এই স্বাদ এবং আনন্দ জাগতিক সব স্বাদ ও আনন্দ এবং রিপুর সকল ভোগ বিলাস থেকে উন্নত ও মহান।

তিনি (আ.) বলেন, যেভাবে একজন রোগী পরম উৎকৃষ্ট খাবারের স্বাদ থেকেও বঞ্চিত থাকে অনুরূপভাবে, হ্যাঁ অবিকল সেভাবেই চরম দুর্ভাগা মানুষই আল্লাহ্র ইবাদতকে উপভোগ করে না। যদি একজন রোগী রোগের কারণে এবং মুখ তিতা হওয়ার কারণে একটি উত্তম খাবার পছন্দ না করে, এর স্বাদ যদি না পায় তার অর্থ এটি নয় যে, সেই খাবার নষ্ট বরং এর অর্থ হলো, সে অসুস্থ। অনুরূপভাবে যে নামায এবং ইবাদত উপভোগ করে না তার অর্থ এমনটি নয় যে, নামাযে কোন আনন্দ বা স্বাদ নেই বা আল্লাহ্ তা’লা রাখেন নি। আল্লাহ্ তা’লা অবশ্যই তা অন্তর্নিহিত রেখেছেন কিন্তু মানুষের নিজের স্বভাব, প্রকৃতি, অসুস্থতা এবং রুচি বিকৃতির কারণে সে তার স্বাদ পায় না।

অতএব আমাদের উচিত নামায উপভোগ করার চেষ্টা করা। এটিকে মাথার বোঝা হিসেবে ছুড়ে ফেলার জন্য পড়া উচিত নয়। এমন পরিস্থিতি যদি হয় তাহলে আমি যেমনটি বলেছি, অনেকেই রাত দীর্ঘ হলে ফজরের নামাযে আসে কিন্তু রাত ছোট হলে ফজরের নামাযে আসা ছেড়ে দেয়। আশা করি, তারা স্বাদ পাওয়ার উদ্দেশ্যে এদিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করবে এবং অন্যান্য বেলার নামায পড়ার বিষয়েও তারা মনোযোগী হবে।

এরপর নামাযের আনন্দ এবং নামাযের স্বাদ পাওয়া সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) অন্যত্র বলেন, “বস্তুতঃ আমি দেখি, নামাযে মানুষের উদাসীন্য এবং অলস্যের কারণ হলো, তারা সেই আনন্দ এবং স্বাদ সম্পর্কে অনবহিত যা আল্লাহ্ তা’লা নামাযে অন্তর্নিহিত রেখেছেন।এছাড়া শহর এবং গ্রামে আরও বেশি আলস্য এবং ঔদাসীন্য প্রদর্শিত হয়। শতভাগ তো দূরের কথা শতকরা পঞ্চাশ ভাগ মানুষও সত্যিকার ভালোবাসার সাথে নিজ প্রভুর দরবারে বিনত হয় না বা মাথা নত করে না। প্রশ্ন দাঁড়ায়, কেন তারা এই আনন্দ এবং স্বাদ সম্পর্কে অবহিত নয় আর কেন তারা কখনও এই স্বাদ পায়নি? ধর্মে এমন ফাঁকা কোন নির্দেশ নেই। অনেক সময় এমন হয় যে, আমরা আমাদের কাজে মগ্ন থাকি, মুয়াযযিন আযান দেয় অথচ মানুষ তা শোনাও পছন্দ করে না। অর্থাৎ আযানের ধ্বনি কানে পড়লে তারা তা শুনতেও চায় না বা মনোযোগই দেয় না, এভেবে যে এখন তো নামাযে যেতে হবে। এদের অবস্থা বড় করুন। এখানেও অনেকেই এমন আছে, তাদের দোকান মসজিদেরই নীচে কিন্তু কোন সময় গিয়ে নামাযে দাঁড়ায়ও না। অতএব আমি বলতে চাই, হৃদয়ে সুগভীর অন্তর্জালা নিয়ে এবং পরম আবেগদিয়ে দোয়া করা উচিত, যেভাবে ফলফলাদি এবং হরেক প্রকার জিনিসে বিভিন্ন প্রকার স্বাদ দিয়েছে, তদ্রুপ নামায এবং ইবাদতেরও একটিবার স্বাদ পাইয়ে দাও।

তিনি (আ.) বলেন, মানুষ মুখে খাবার এবং ফলফলাদির স্বাদ ঠিক সেভাবে তোমরা এ এই দোয়া কর যে, হে আল্লাহ্! আমাদেরকে নামাযেরও স্বাদ পাইয়ে দাও। সুস্বাদু কিছু খেলে মনে থাকে। দেখ! কেউ যদি গভীর আগ্রহ ও আনন্দ নিয়ে কোন সুদর্শনকে দেখে তাহলে তার তা ভালোভাবে স্মরণ থাকে। এছাড়া কুৎসিত চেহারা ও ঘৃণ্য অবয়বের কাউকে দেখলে তার পুরো অবস্থা এর গঠনের নিরিখে তার সামনে বীমূর্ত হয়। অতএব সুন্দর-অসুন্দর উভয়ের কথা মনে থাকে। তবে, যদি কোন সম্পর্ক না থাকে বা সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত না হয় তাহলে কিছুই মনে থাকে না।

অনুরূপভাবে বেনামাযীদের দৃষ্টিতে নামায হলো, এক প্রকার জরিমানা, অর্থাৎ অনর্থক সকালে উঠে প্রচন্ড শীতের মধ্যে ওযু করে আরামদায়ক সুখনিদ্রা বিসর্জন দিয়ে বেশ কয়েক প্রকার সুখ ও আনন্দ জলাঞ্জলি দিয়ে পড়তে হয়। আসল কথা হলো, নামাযের প্রতি তার এক প্রকার অনীহা রয়েছে যা সে বুঝে উঠতে পারে না। সেই স্বাদ এবং প্রশান্তি যা নামাযে অন্তর্নিহিত আছে সে সম্পর্কেও সে অবহিত নয়, তাই নামাযে সে কীভাবে স্বাদ পেতে পারে? তিনি (আ.) বলেন, আমি দেখি, একজন মদ্যপ এবং নেশাখোর যতক্ষণ আনন্দ না পায়, যতক্ষণ

না তার নেশা হয় উপর্যুপরি পান করতে থাকে। বুদ্ধিমান এবং পুণ্যবান মানুষ এ দৃষ্টান্ত থেকেও শিখতে পারে। নেশাবাজের এই যে দৃষ্টান্ত তা থেকেও একজন বুদ্ধিমান মানুষ শিখতে পারে বা লাভবান হতে পারে, তা কী? তাহলো নিয়মিত নামায পড়া এবং অবিরত পড়তে থাকাএবং স্বাদ পাওয়ার চেষ্টা অব্যাহত রাখা।

যতক্ষণ তার কাছে নামায উপভোগ্য না হয়ে উঠে আল্লাহ্র কাছে দোয়াও করা উচিত এবং রীতিমত নামায পড়তে থাকা উচিত। যেভাবে মদ্যপ ব্যক্তির মন-মস্তিকে একটি স্বাদ বা নেশা বিরাজ করে যা হস্তগত করা তার লক্ষ্য হয়ে থাকে অনুরূপভাবে অন্তর এবং সমস্ত শক্তি-বৃত্তির চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নামাযে সেই আনন্দ বা স্বাদ পাওয়া। এরপর সেই স্বাদ ও আনন্দ লাভের জন্য নিষ্ঠা এবং আবেগের সাথে হৃদয় থেকে দোয়া উদ্ভূত হওয়া উচিতযা নিদেনপক্ষে সেই নেশাখোরের ব্যাকুলতা এবং উৎকণ্ঠার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। অতএব এক প্রকার ব্যাকুলতা ও উৎকণ্ঠা সৃষ্টি হওয়া দরকার যা দোয়ায় পর্যবসিত হবে। তিনি (আ.) বলেন, আমি বলবো আর প্রকৃত অর্থেই বলছি, নামাযে সেই স্বাদ এবং আনন্দ অবশ্যই লাভ হবে।

এরপর নামায পড়ার সময় সেসব লক্ষ্যও যেন অর্জন যা নামাযের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, আর ইহ্সান (নামায সুন্দরভাবে পড়া) যেন লক্ষ্য হয়। তিনি (আ.) বলেন,

اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ؕ

(সূরা হূদ: ১১৫) অর্থাৎ পুণ্য পাপকে দূরীভূত করে। অতএব এসব পুণ্য এবং স্বাদ ও আনন্দকে হৃদয়ে জাগ্রত রেখে দোয়া করা উচিত অর্থাৎ সেই নামায যেন ভাগ্যে জোটে যা সত্যবাদী এবং সৎকর্মশীলদের নামায। এই যে বলা হয়েছে,

اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ؕ

অর্থাৎ পুণ্য বা নামায পাপ মোচন করে, অন্যত্র যা বলা হয়েছে, নামায অশ্লীলতা এবং অপছন্দনীয় কাজ থেকে বিরত রাখে অথচ আমরা দেখি, অনেকে নামায পড়া সত্ত্বেও আবার পাপ করে।

পৃথিবীতে এমনটিই দেখা যায় যে, অনেকেই আছে যারা বাহ্যতঃ নামায পড়ে আবার পাপেও লিপ্ত থাকে। এর উত্তর হলো, এরা নামায পড়লেও সেই প্রেরণা এবং তাক্ওয়ার সাথে পড়ে না, সত্যের সাথে এবং গভীর মনোযোগ দিয়ে নামায পড়ে না। তারা প্রথাগতভাবে ও অভ্যাসবশে সিজদা করে মাত্র। তাদের আত্মা মৃত। আল্লাহ্ তা'লা এই নামাযের নাম হাসানাত বা পুণ্য রাখেন নি। এখানেঅর্থ একই হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লা 'সালাত' শব্দের পরিবর্তে 'হাসানাত' শব্দ ব্যবহার করেছেন যার উদ্দেশ্য হলো, নামাযের বৈশিষ্ট্য আর নামাযের সৌন্দর্যের প্রতি ইঙ্গিত করা। অর্থাৎ সেই নামায পাপ বিমোচন করে যা নিজের মাঝে সত্যের প্রেরণা রাখে এবং কল্যাণ প্রবাহের বৈশিষ্ট্য নিজের মাঝে ধারণ করে। এমন নামায অবশ্যই পাপ দূরীভূত করে। নামায কেবল ওঠা বসার নাম নয়। নামাযের সত্যিকার প্রাণ এবং সার হলো সেই দোয়া যা নিজের মাঝে এক প্রকার আনন্দ এবং স্বাদ অন্তর্নিহিত রাখে।

এরপর নামাযের বিভিন্ন অবস্থার উদ্দেশ্য ও প্রজ্ঞা আর আমাদের ওপর এর যে প্রভাব পড়া উচিত এর বিস্তারিত বিবরণ দিতে গিয়ে এক জায়গায় তিনি (আ.) বলেন, স্মরণ রেখো! নামাযে বাস্তব এবং বাহ্যিক উভয় অবস্থার সমাহার ঘটা আবশ্যক অর্থাৎ প্রধানতঃ বাহ্যিক বা দৈহিকভাবে নামাযের জন্য দন্ডায়মান হওয়া দ্বিতীয়তঃ এই সচেতনতাও থাকা আবশ্যক যে, মানুষ আল্লাহ্র সামনে দন্ডায়মান হয়ে আল্লাহ্র সাথে কথা বলছে।

তিনি (আ.) বলেন, অনেক সময় রূপকভাবে কোন সংবাদ দেয়া হয় অর্থাৎ রূপক অবস্থা সৃষ্টি হয়। তিনি (আ.) বলেন,কোন কোন সময় ছবির মাধ্যমে কোন কথা প্রকাশ করা হয় অর্থাৎ এমন ছবি দেখানো হয় যার মাধ্যমে দর্শক বুঝতে পারে যে, এটি এর উদ্দেশ্য। অনুরূপভাবে নামায হলো খোদা তা'লার ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ের প্রতিচ্ছবি। খোদা তা'লা মানুষের কাছে কী চান নামাযের বিভিন্ন অবস্থায় তার এক রূপক প্রতিফলন সেটি, এক রূপক দৃষ্টান্ত। নামাযে যেভাবে মৌখিকভাবে কিছু পড়া হয় অনুরূপভাবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উঠা-বসা বা গতিবিধির মাধ্যমে কিছু দেখানো হয়। নামাযে আমরা মৌখিকভাবে যা পড়ি, আমাদের যে অঙ্গ-ভঙ্গি তা-ও সেই শব্দের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত। মানুষ যখন দাঁড়ায়, আর আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসা এবং পবিত্রতার গান গায় এর নাম রেখেছেন 'ক্বিয়াম' অর্থাৎ দন্ডায়মান হওয়া। প্রত্যেক ব্যক্তি জানে, খোদার প্রশংসা এবং গুণকীর্তনের সাথে সামাঞ্জস্যপূর্ণ বিষয় হলো, ক্বিয়াম বা দন্ডায়মান হওয়া।

তিনি (আ.) বলেন, দেখ! বাদশাহ্দের সমীপে কাসিদা বা কবিতা দাঁড়িয়েই পড়া হয়। অতএব যেখানে বাহ্যিক ক্বিয়াম রাখা হয়েছে সেখানে মৌখিক প্রশংসা বা গুণকীর্তন রাখা হয়েছে।এর অর্থ হলো, আধ্যাত্মিকভাবেও তোমরা আল্লাহ্ তা'লার দরবারে দন্ডায়মান হও। যখন মানুষ দন্ডায়মান হয় আর সূরা ফাতিহা পড়ে এবং আল্লাহ্র প্রশংসা ও গুণকীর্তন করে তখন আধ্যাত্মিকভাবেও হৃদয়ে ক্বিয়াম বিরাজ করা উচিত।

তিনি (আ.) বলেন, কোন কথার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েই প্রশংসা করা হয়। যে ব্যক্তি সত্যায়নকারী হয়ে কারো প্রশংসা করেসে একটি মতামতের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েই তা করে। মিথ্যা প্রশংসা তো করা হয় না। মানুষ যদি সত্যবাদী হয়,কারো সত্যায়ন করেই সে তার প্রশংসা করে। তাই যে আলহামদুলিল্লাহ্ বলে, সত্যিকার অর্থে আলহামদুলিল্লাহ্ সে তখন বলতে সক্ষম যখন তার পূর্ণ বিশ্বাস জন্মে যে, সকল প্রকার প্রশংসা আল্লাহ্ তা'লারই। এই কথা যদি পূর্ণ স্বতঃস্ফূর্ততার সাথে হৃদয়ে লালন করে তাহলে এটি আধ্যাত্মিক ক্বিয়াম। সব প্রশংসা খোদা তা'লার, তিনিই সব প্রশংসার যোগ্য, তাঁরই প্রশংসা করা উচিত আর তাঁকে বাদ দিয়ে এমন কেউ নেই যার প্রশংসা করা যেতে পারে; এই যদি হৃদয়ের চিত্র হয় তাহলে এটি শুধু হাত বেধে দন্ডায়মান হওয়া নয় বরং এটি আধ্যাত্মিকভাবেও দন্ডায়মান হওয়া বা ক্বিয়াম কেননা হৃদয় এর ওপর প্রতিষ্ঠিত

হয়। তখন ধরে নেয়া হয় যে, সে দন্ডায়মান হয়েছে। বাহ্যিক অবস্থা অনুসারে সে দন্ডায়মান হয়েছে যেন এই আধ্যাত্মিক ক্বিয়াম তার ভাগ্যে জোটে। আন্তরিক অবস্থা অনুসারে সে দৈহিকভাবে দন্ডায়মান হয়েছে।

এরপর রুকুতে ‘সুবহানা রাব্বিআল আযীম’ বলে। রীতি হলো, কারো মাহাত্ম্য যখন মানুষ স্বীকার করে তখন তার সামনে সে ঝুঁকে। মাহাত্ম্যের দাবি হলো, তার জন্য রুকু করা। মৌখিকভাবেও ‘সুবহানা রাব্বিআল আযীম’ ঘোষণা করেছে আর ব্যবহারিকভাবেও ঝুঁকেছে। মুখ আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য ঘোষণা করে, তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে আর একই সাথে মানুষ রুকুতে যায় অর্থাৎ ঝুঁকে যায়। এটি সেই উক্তির সাথে বাস্তব অবস্থার সামঞ্জস্য। মুখে শব্দ উচ্চারিত হয়েছে আর দৈহিকভাবেও ঝুঁকেছে।

এরপর তৃতীয় উক্তি হলো, ‘সুবহানা রাব্বিআল আ’লা। ‘আ’লা’ হলো আফআলুল তাফযীল (আরবী ব্যকরণে সবচেয়ে গভীর অর্থ প্রদানকারী ক্রিয়ার রূপ)। শ্রেষ্ঠত্ব প্রদানের পরম বাহ্যিক বহিঃপ্রকাশ হলো, সেজদা। খোদা তা’লার মাহাত্ম্যের সবচেয়ে মহান বহিঃপ্রকাশ হলো সিজদার অবস্থা অর্থাৎ সেই দৈহিক অঙ্গ-ভঙ্গি যাহলো সিজদা। খোদার মাহাত্ম্য এবং শ্রেষ্ঠত্ব, তাঁর পবিত্রতা এবং গরিমা বর্ণনার এই রীতি সিজদার দাবী রাখে অর্থাৎ আল্লাহ্‌র দরবারে সম্পূর্ণভাবে সিজদাবনত হওয়া। এর বাস্তব ও বাহ্যিক প্রতিচ্ছবি হলো সিজদাবনত হওয়া। ‘সুবহানা রাব্বিআল আলা’র সাথে সামাঞ্জস্যপূর্ণ দৈহিক অবস্থাও তাৎক্ষণিকভাবে সে বরণ করল অর্থাৎ আল্লাহ্ তা’লা যে মহান তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের আন্তরিক স্বীকারোক্তির পাশাপাশি মাটিতে সিজদা করে। এই অবস্থা সে ধারণ করে, এটিই সেই অবস্থার বাস্তব বহিঃপ্রকাশ।

অতএব এই হলো তিনটি মৌখিক স্বীকারোক্তির পাশাপাশি তিনটি দৈহিক অঙ্গ-ভঙ্গি। প্রথমে একটি চিত্র তাঁর সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে। সকল প্রকার ক্বিয়াম করা হয়েছে, জিহ্বা যা দেহের অংশ সেও ঘোষণা করল এবং এতে সে যোগ দিল। তৃতীয় জিনিস ভিন্ন তা যদি অন্তর্ভুক্ত না হয় তাহলে নামায হয় না – তা কী? তা হলো সেই হৃদয়। হৃদয়ের ক্বিয়ামও এর জন্য আবশ্যক। এর ওপর দৃষ্টিপাতে আল্লাহ্ যেন দেখতে পান, সত্যিকার অর্থে সে প্রশংসা করছে এবং দন্ডায়মান রয়েছে। আত্মাও দন্ডায়মান হয়ে প্রশংসা করে এবং সিজদা করে। কেবল দেহই নয় বরং আত্মাও দন্ডায়মান রয়েছে অর্থাৎ হৃদয়ের অবস্থা আল্লাহ্ তা’লা জানেন, আল্লাহ্ দেখছেন, দেহের পাশাপাশি তার আত্মাও আল্লাহ্‌র প্রশংসা করছে বা রুকু করছে বা সিজদাবনত। যখন ‘সুবাহানা রাব্বিআল আযীম’ বলে তখন শুধু মাহাত্মের এই স্বীকারোক্তিই যথেষ্ট নয় বরং একই সাথে তাকে ঝুঁকতেও হবে আর একই সাথে আত্মারও ঝুঁকা আবশ্যক। তৃতীয় পর্যায়ে খোদার দরবারে সিজদাবনত হয়েছে, তাঁর পদমর্যাদার মাহাত্ম্য বা উচ্চতার ঘোষণার পাশাপাশি দেখা উচিত, আত্মাও আল্লাহ্ তা’লার একত্ববাদের আস্তানায় সিজদাবনত কি-না অর্থাৎ একইভাবে হৃদয়েরও সিজদা আবশ্যক। বস্তুতঃ যতক্ষণ এই অবস্থা সৃষ্টি না হবে ততক্ষণ যেন সে আশ্বস্ত না হয়। কেননা; “ইউকিমুনাস সালাতা”র অর্থ এটিই।

যদি প্রশ্ন করা হয়, এই অবস্থা কীভাবে সৃষ্টি হতে পারে, কীভাবে সৃষ্টি করা যেতে পারে? এর উত্তর হলো, রীতিমত নামায পড়া এবং কুমন্ত্রণা ও সন্দেহ সৃষ্টি হলে দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত না হওয়া। নামাযের সময় কুমন্ত্রণা আর সন্দেহ সৃষ্টি হলে উদ্বিগ্ন না হয়ে রীতিমত নামায পড়তে থাকো। প্রাথমিক অবস্থায় সন্দেহ ও কুমন্ত্রণার সাথে অবশ্যই যুদ্ধ করতে হয়, শয়তান আক্রমণ করে, শয়তানের সাথে যুদ্ধ চলতে থাকে। এর চিকিৎসা হলো, অবিচলতার সাথে ক্লান্তি-শ্রান্তির ঊর্ধ্বে থেকে এবং ধৈর্যের সাথে নামাযে রত থাকা, আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করতে থাকা। অবশেষে সেই অবস্থা সৃষ্টি হয় যার কথা আমি এখনই বলেছি। অতএব অবিচলতা হলো শর্ত। এটি যদি মানুষের মাঝে সৃষ্টি হয় তাহলে খোদা তাঁর বান্দার কাছে ছুটে আসেন, এরপর খোদার কৃপাবারীও বর্ষিত হয় । কিন্তু এই সত্য এবং বাস্তবতা অনেকে বুঝে না, তড়িঘড়ি করে খোদা তা’লার দ্বার পরিত্যাগ করে বা এর গুরুত্ব বুঝে না আর দুনিয়ার মানুষের দ্বারেধরনা দেয়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, এরপর স্মরণ রাখার যোগ্য বিষয় হলো, এই নামায যা সত্যিকার অর্থেই নামায তা দোয়ার মাধ্যমেই লাভ হতে পারে। আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের কাছে হাত পাতা মু’মিন সুলভ আত্মাভিমানের স্পষ্ট এবং প্রকাশ্য বিরোধী। কেননা দোয়ার এ ধরণ বা রীতি কেবল খোদা তা’লারই প্রাপ্য। মানুষ সচরাচর দৈনন্দিন জীবনে একে অন্যের মুখাপেক্ষীহয়েই থাকে, একে অন্যের কাছে কিছু চেয়েই থাকে কিন্তু কারো কাছে এমনভাবে হাত পাতা যা শুধু খোদা তা’লার সামনে পাতা উচিত, আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে অন্য কারও কাছে আশা রাখা এবং অন্য কারও ওপর নির্ভর করা এটি ভুল।

তিনি (আ.) বলেন, মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত নিজেকে সম্পূর্ণরূপে তুচ্ছ জ্ঞান করে আল্লাহ্ তা’লার দরবারে হাত না পাতবে, তাঁর কাছে না চাইবে, নিশ্চিত জেনো, প্রকৃত অর্থে সেই ব্যক্তি মুসলমান এবং সত্যিকার মু’মিন আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্য নয়। ইসলামের প্রকৃত অর্থ এবং মর্ম হলো, তার সব শক্তি, তা আভ্যন্তরীণ হোক বা বাহ্যিক, পুরোটাই যেন খোদা তা’লার আস্তানায় সিজদাবনত থাকে। যেভাবে একটি বড় ইঞ্জিন অনেক কলকব্জাকে পরিচালিত করে এক ধরণের গতি সৃষ্টি করে অনুরূপভাবে মানুষ যতক্ষণ তার প্রতিটি কাজ, প্রত্যেক গতিবিধি এবং উঠা বসাকে সেই ইঞ্জিনের মহান শক্তির অধীনস্ত না করবে সে কীভাবে খোদার খোদকারীতে বিশ্বাসী বলে গণ্য হতে পারে? আর

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ
السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ

(সূরা আল্ আন’আম:৮০) বলার সময় প্রকৃত অর্থেই হানিফ আখ্যায়িত হতে পারে কি? মৌখিক স্বীকারোক্তির পাশাপাশি তাৎক্ষণিকভাবে এদিকে যদি মনোযোগ নিবদ্ধ হয় তাহলে নিঃসন্দেহে

সে মুসলমান, সে মু’মিন এবং সে হানিফ বা একত্ববাদী। মৌখিক স্বীকারোক্তির পাশাপাশি যদি আল্লাহ্‌র প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হয় তাহলে সে মুসলমানও আর মু’মিনও আর হানিফ বা একত্ববাদীও। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে অন্যের কাছে হাত পাতে আর সেদিকেও আকৃষ্ট হয়, অর্থাৎ একদিকে আল্লাহ্‌র কাছে ঝুঁকে অপরদিকে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যদের সামনেও ঝুঁকে, তার স্মরণ রাখা উচিত, সে অনেক বড় দুর্ভাগা এবং বঞ্চিত। তার জীবনে সেই সময় আসবে যখন সে মৌখিকভাবে বা বাহ্যিকভাবেও আল্লাহ্‌র সামনে আর ঝুঁকতে পারবে না অর্থাৎ আল্লাহ্ তা’লা তাকে ছেড়ে দিবেন।একটি সময় এমন আসবে যখন বাহ্যিক অর্থেও সে খোদা তা’লার সামনে সিজদাবনত হতে পারবে না।

তিনি (আ.) বলেন, নামায ছেড়ে দেয়ার আর আলস্যের একটি কারণ হলো, মানুষ যখন আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে অন্যের সামনে নতহয় তখন আত্মা এবং হৃদয়ের শক্তি সেই বৃক্ষের ন্যায় হয়ে যায় যার শাখা-প্রশাখাগুলোর প্রথমে একপাশে ফিরিয়ে দিলে সেই অবস্থায়ই তা বড় হয় আর তখন তা সেদিকেই ঝুঁকে থাকে। আল্লাহ্ তা’লার পক্ষ থেকে তার হৃদয়ে এক প্রকার কঠোরতা সৃষ্টি হয়ে তাকে পাথর বানিয়ে দেয় আর তা জড় বস্তুতুল্য হয়ে যায়। গাছের ডাল-পালা যদি একদিকে ঘুরিয়ে বেধে দেয়া হয় তাহলে গাছ সে দিকেই ঝুঁকে যায়। অনুরূপভাবে মানুষও যদি বান্দার প্রতি আকৃষ্ট হয় তাহলে বান্দারই হয়ে যায়। খোদার বিষয়ে তার হৃদয় কঠোর হয়ে যায়।

তিনি (আ.) বলেন, গাছের যেসব শাখা-প্রশাখাবা ডাল-পালা এক দিকে ঝুঁকে যায় সেগুলো আর অন্য দিকে ফিরতে পারে না অনুরূপভাবে হৃদয় এবং আত্মা খোদা তা’লা থেকে ক্রমশঃ দূরে সরে যায়। অতএব এটি খুবই ভয়াবহ এবং হৃদয়কে কাঁপিয়ে তোলার মত বিষয় যে, মানুষ আল্লাহ্ তা’লাকে পরিত্যাগ করে অন্যের কাছে হাত পাতবে। সেকারণেই যথাযথ প্রস্তুতির সাথে এবং রীতিমত নামায পড়া একান্ত আবশ্যক যেন প্রথম থেকেই তা এক স্থায়ী অভ্যাসের মত হৃদয়ে গ্রথিত হয় আর যেন আল্লাহ্‌র দিকে ঝুঁকার বা প্রত্যাবর্তনের মনমানসিকতা সৃষ্টি হয়; তাহলে ধীরেধীরে এমন একটি সময় আসে যখন অন্যের সাথে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্ক ছিন্ন হয়েমানুষ এক জ্যোতির উত্তরাধিকারী হয় এবং আধ্যাত্মিক প্রশান্তি লাভ করে। প্রথম দিকে ঐকান্তিক চেষ্টা করে নামায পড়তে হয়, কিন্তু অভ্যাস হয়ে গেলে, বিশুদ্ধ চিত্তে যদি আল্লাহ্‌র সামনে বিনত হতে থাকে তাহলে খোদার কৃপারাজির উত্তরাধিকারী হয়।

তিনি (আ.) বলেন, আমি বিষয়টি পুনরায় জোর দিয়ে বলব, পরিতাপ যে, আমি সেই শব্দ পাইনি যার মাধ্যমে অন্যের সামনে ঝুঁকার ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরা সম্ভব হতো। মানুষের কাছে গিয়ে আকুতি-মিনতি করে, তোষামোদ করে।একাজখোদা তা’লার আত্মাভিমানে আঘাত হানে। এটি মানুষের খাতিরে নামায পড়ার নামান্তর। অতএব খোদা তা’লা এথেকে পৃথক হয়ে একে দূরে ঠেলে দেন। আমি সাদামাটা ভাষায় এ বিষয়টি বর্ণনা করছি, যদিও বিষয়টি আক্ষরিকভাবে এমন নয় কিন্তু ভালোভাবে বুঝা যায়, এটি একটি জাগতিক দৃষ্টান্ত, বুঝানোর জন্য বর্ণনা করছি। যেভাবে একজন আত্মাভিমানী পুরুষের আত্মাভিমান কখনই এটি দেখা পছন্দ করবে না যে, তার স্ত্রী পর পুরুষের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করবে। কিছু মানুষ এমনও হয়ে থাকে যারা এমতাবস্থায় সেই দুঃশ্চরিত্রা মহিলাকে হত্যা করাও আবশ্যক মনে করে।

তিনি (আ.) বলেন, প্রকৃত দাসত্ব এবং দোয়া বিশেষ করে এই সত্তারই প্রাপ্য। আল্লাহ্ তা’লা চান না যে, অন্য কাউকে মা’বুদ বা উপাস্য আখ্যা দেয়া হবে বা কাউকে এভাবে ডাকা হবে। অতএব স্মরণ রেখ! খুব ভালোভাবে স্মরণ রেখ! যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্যদের সামনে ঝুঁকা আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার নামান্তর। নামায বা একত্ববাদ যাই বল না কেন, ব্যবহারিক অর্থে আল্লাহ্‌র সামনে ঝুঁকাই হলো, নামায। এটি তখন কল্যাণশূন্য এবং অর্থহীন হয় যখন তার সাথে আত্মবিলুপ্তি, আত্মপেষণ এবং একত্ববাদী হৃদয় অন্তর্ভুক্ত না হবে।

কেউ কেউ বলে আমরা অনেক কেঁদেছি, অনেক নামায পড়েছি কিন্তু কোন লাভ হয়নি। এমন মানুষের কথা খণ্ডন করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, অনেকেই মনে করে, আল্লাহ্ তা’লার দরবারে আকুতি-মিনতি ও আহাজারি করলে কিছু লাভ হয় না, এ কথাটি সম্পূর্ণরূপে ভুল এবং মিথ্যা। এমন মানুষ আল্লাহ্ তা’লার সর্বময় ক্ষমতা এবং নিয়ন্ত্রণ বৈশিষ্ট্যে বিশ্বাস রাখে না। যদি তাদের মাঝে সত্যিকার ঈমান থাকত তাহলে তারা এমনটি বলার ধৃষ্টতা দেখাত না। কোন ব্যক্তি যখনই আল্লাহ্ তা’লার দরবারে আসে এবং সত্যিকার অর্থে তওবার সাথে প্রত্যাবর্তন করে আল্লাহ্ সব সময় তার প্রতি কৃপা করেন। এক কবি পরম সত্য বলেছেন,

“আশেক কে শুদ কে ইয়ার বেহালেশ নাযার না কারদ্

এ্যা খাঁজা দারদ্ নিস্ত, ওগার না তবীব হাস্ত”

অর্থাৎ ,সে কিসের প্রেমিক হলো যার প্রতি প্রেমাষ্পদ চোখ তুলেই তাকায় না, হে মানুষ! কোন ব্যাথাই নেই, ডাক্তার অবশ্যই উপস্থিত আছে, তাই তোমার ধারণা ভুল। আল্লাহ্ তা’লা চান তোমরা পবিত্র হৃদয় নিয়ে তাঁর কাছে আস। তাঁর অবস্থা অনুসারে নিজের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন আনয়ন করাই হলো শর্ত। এটি অনেক বড় কথা, তাঁর অবস্থা অনুসারে নিজেদের মাঝে পরিবর্তন আন, যেভাবে তিনি বলেছেন সেভাবে জীবনযাপন কর। যা মানুষকে আল্লাহ্‌র দরবারে যাওয়ার যোগ্য করে নিজের মাঝে সেই পবিত্র পরিবর্তন আনয়ন করে দেখাও। আমি প্রকৃত অর্থেই বলছি, খোদার মাঝে বিস্ময়কর সব ক্ষমতা রয়েছে। তাঁর মাঝে অনন্ত কৃপা এবং কল্যাণরাজি নিহিত আছে কিন্তু তা দেখার জন্য ভালোবাসার চোখ সৃষ্টি কর। আল্লাহ্‌কে সত্যিকার অর্থে ভালোবাস, যদি সত্যিকার ভালোবাসা থাকে তাহলে আল্লাহ্ তা’লা অনেক বেশি দোয়া গ্রহণ করেন, আর সাহায্য এবং সমর্থন প্রকাশ করেন।

অতএব আমাদের নিজেদের মাঝে এমন পরিবর্তন আসা উচিত যেন আল্লাহ্ তা’লা

আমাদের দোয়া শোনেন। যারা আপত্তি করে যে, খোদা তা'লা শোনেন না বা গ্রহণ করেন না তাদের অধিকাংশ এমন যারা পাঁচবেলার নামাযই ঠিকমত পড়ে না। নামাযের কথা তাদের কেবল তখন মনে পড়ে যখন জাগতিক কোন সমস্যায় জর্জরিত হয়। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমি অবশ্যই শুনবো কিন্তু আমার নির্দেশও তোমরা মেনে চল। সবার আত্ম-অবস্থান খতিয়ে দেখা উচিত যে, খোদার নির্দেশাবলী সে মেনে চলে কি না।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) লিখেছেন, কুরআনে সাতশত আদেশ-নিষেধ আছে, এখন যদি আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকে তাহলে প্রথমে এ কথার উত্তর দিক, কয়জন এমন আছে যারা এই সাতশত নির্দেশ মেনে চলে? যদি তুলনা করতে হয় তাহলে এখানেও তুলনা করা আবশ্যক। এটি খোদার পরম অনুগ্রহ যে, এসব সত্ত্বেও বান্দার প্রতি করুণা প্রদর্শন করে তাদের ভুল ভ্রান্তিকে তিনি উপেক্ষা করেন, তাদের দোয়াও গ্রহণ করেন। অনেকেই এমন আছে যারা হয়তো রীতিমত নামাযেও অভ্যস্ত নয় কিন্তু তাদের দোয়াও গৃহীত হয়েছে, এটি খোদার অনুকম্পা। বরং আল্লাহ্ তা'লা দোয়া না করা সত্ত্বেও তাঁর অন্যান্য বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলীর অধীনে মানুষের অভাব মোচন করেন। তাই অভিযোগের কোন সুযোগ নেই। কাজেই আমাদেরকে খোদার নির্দেশ অনুসারে চলার চেষ্টা করা উচিত। আর সে অনুসারে নিজেদের ইবাদত, নামায এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করা উচিত।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত পুরোপুরি একত্ববাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত না হবে তার মাঝে ইসলামের ভালোবাসা এবং মাহাত্ম্য সৃষ্টি হতে পারে না। তিনি (আ.) বলেন, নামাযের স্বাদ এবং আনন্দ সে পেতে পারে না। সফলতার চাবিকাঠি হলো নামায, যতক্ষণ নোংরা ইচ্ছা, অভিপ্রায়, নোংরা পরিকল্পনা এবং ষড়যন্ত্র ভস্মিভূত না হবে, আমিত্ব এবং শত্রুতা দূরীভূত হয়ে আত্মবিলুপ্তি এবং বিনয় সৃষ্টি না হবে, ততক্ষণ আল্লাহ্‌র প্রকৃত বান্দা আখ্যায়িত হতে পারে না। তিনি (আ.) আরো বলেন, পূর্ণ দাসত্ব শেখানোর জন্য সর্বোত্তম শিক্ষক এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম হলো নামায। যদি প্রকৃত অর্থে বান্দা হতে হয় এর জন্য সর্বোত্তম জিনিস, সর্বোত্তম উপায় এবং সর্বোত্তম শিক্ষক হলো, নামায। তিনি (আ.) বলেন, আমি আবার তোমাদের বলছি, যদি খোদার সাথে সত্যিকার সম্পর্ক এবং সত্যিকার যোগসূত্র স্থাপন করতে চাও তাহলে নামাযের ওপর প্রতিষ্ঠিত হও। এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত হও যে, শুধু তোমাদের দেহ এবং জিহ্বাই নয় বরং তোমাদের রূহের প্রতিটি আবেগ অনুভূতি যেন মূর্তিমান নামায হয়ে যায়।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তৌফিক দিন, আমরা যেন নিজেদের নামাযের সেভাবে সুরক্ষা এবং হিফাযত করতে পারি যেন আমাদের আত্মা এবং প্রতিটি আবেগ-অনুভূতি সত্যিকার অর্থে নামায আদায়কারী হয়ে যায়।

নামাযের পর একজনের গায়েবানা জানাযা পড়াব যা করাচীর সাবেক আমীর শেখ রহমতুল্লাহ্ সাহেব-এর স্ত্রী আসগরী বেগম সাহেবার জানাযা। গত ২৭শে মার্চ আমেরিকায় স্বল্পকাল অসুস্থ্য থেকে ৯০ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন, ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।

১৯৪৩ সনে শেখ রহমতুল্লাহ্ সাহেবের সাথে তার বিয়ে হয়, স্বামীর পূর্বেই তিনি ১৯৪৪ সনে লাহোরে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর হাতে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। সারা জীবন খিলাফতের প্রতি, বয়আতের অঙ্গীকারকে পরম নিষ্ঠা এবং স্বচ্ছতার সাথে পালন করেছেন। সন্তান-সন্ততিকে সব সময় খিলাফতের সাথে সুদৃঢ় সম্পর্ক বজায় রাখার নসীহত করেন। খিলাফতের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। যখন থেকে এমটিএ আরম্ভ হয়েছে, এমটিএ দেখা তার সবচেয়ে পছন্দনীয় কাজ ছিল। ওসীয়ত করেছিলেন, ধৈর্যশীলা, কৃতজ্ঞ, দোয়াগো এবং তাহাজ্জুদ গুযার ছিলেন, নামায, রোযায় গভীরভাবে অভ্যস্ত ছিলেন, রীতিমত কুরআন তিলাওয়াত করতেন। তার স্বামী করাচীতে জামাতের যে দায়িত্ব পালনের সুযোগ লাভ করেছেন তখন তার পাশাপাশি তিনিও জামাতের সেবা অব্যাহত রেখেছেন। আতিথেয়তা তার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল। যখন শেখ সাহেব করাচীর আমীর ছিলেন তার ব্যস্ততা ছিল সীমাহীন। সে যুগে আতিথেয়তার দায়িত্ব অনেক বেশি পালন করতে হতো, এই দায়িত্ব তিনি খুব সুচারুরূপে পালন করেছেন। তিনি খলীফা সানী এবং খলীফা সালেসের এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে'র আতিথ্যের সম্মানলাভ করেছেন। আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রেও তিনি অনেক অগ্রগামী ছিলেন। ১৯৫০ সনে জামাতের ওপর আর্থিক অসচ্ছলতার একটি যুগ আসে তখন খলীফা সানী (রা.) আর্থিক কুরবানীর বিশেষ তাহরীক করেন। তখন শেখ সাহেব (অর্থাৎ তার স্বামী) আয়ের একটা বড় অংশ জামাতের জন্য দিতে থাকেন; তিনিও কুরবানীতে তার সমঅংশীদার ছিলেন। খুবই সহজ-সরল জীবন-যাপন কারীনি, কৃত্তিমতামুক্ত নারী ছিলেন। তার ছেলে লিখেন, প্রায় সময় খলীফাতুল মসীহ্‌র কাছে দোয়ার পত্র লেখার নসীহত করতেন সন্তানদের।

তিনি পাঁচজন পুত্র, দুইজন কন্যা এবং ৪৩জন পৌত্র-পৌত্রী, দৌহিত্র-দৌহিত্রী স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে রেখে গেছেন। তার এক পুত্র ডা. নাসিম রহমতুল্লাহ্ সাহেব আমেরিকার নায়েব আমীর, আমাদের ওয়েব সাইট **alislam.org**-এর ইনচার্জও। অনুরূপভাবে তাদের জামাতা রহমানী সাহেব এখানে বসবাস করেন, তিনিও দীর্ঘকাল সেক্রেটারী ওসীয়্যত হিসেবে কাজ করেছেন। তার স্ত্রী জামিলা রহমানী নিজ হালকায় সেক্রেটারী মাল এবং অন্যান্য দায়িত্বও পালন করেছেন এবং করছেন। তার এক পুত্র ফরহাতুল্লাহ্ শেখ সাহেব ফয়সালাবাদের নায়েব আমীর। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার মর্যাদা উন্নীত করুন এবং তার সন্তান-সন্ততি এবং বংশধরদের জামাত এবং খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত রাখুন। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনূদিত।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী

ইযালা-এ-আওহাম

(সন্দেহ-সংশয় নিরসন)

প্রণয়ন ও প্রকাশনা ১৮৯১

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আ.)

(২০তম কিস্তি)

জানা আবশ্যক, কাশ্ফ (বা দ্বিব্যদর্শন) সংশ্লিষ্ট জগতে বড়ো বড়ো বিস্ময়কর বিষয়াদি হয়ে থাকে। নানা রকম উপমা দৃশ্যত পরিদৃষ্ট হয়ে অনেক সময় এমন সব জিনিস কাশ্ফের জগতে বাহ্যিক ও দৈহিক আকারে রূপান্তরিত হয়ে পরিদৃষ্ট হয় যা প্রকৃতপক্ষে রূহানী বা আধ্যাত্মিক হয়ে থাকে। কোনো সময় মানুষের আকারে কোনো জিনিস দেখা যায়। অথচ সেটি মানুষ নয়। যেমন, সাহাবী হযরত যিরারাহ্ আরবের এক রাজা নুমান-বিন-মুনযিরকে সার্বিক রাজকীয় সাজ-সজ্জায় সজ্জিতরূপে স্বপ্নে দেখলেন এবং মহানবী (সা.) এর তা'বির (ব্যাখ্যা) করলেন যে এদ্বারা আরব দেশকে বোঝায়, যা পুনরায় স্বীয় সৌন্দর্য ও সাজ-সজ্জার দিকে ফিরে এসেছে। এটি এ বিষয়ের স্পষ্ট প্রমাণ যে কাশ্ফে দেখা বিষয়াদির তা'বির (বা ব্যাখ্যা) কোথা থেকে কোথায় চলে যায়। সুতরাং এ অধমের এ বিষয়ে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা রয়েছে যে কোনো সময় স্বপ্ন অথবা কাশ্ফে আধ্যাত্মিক বিষয়াদি দৈহিক যেমন মানুষের আকারে রূপান্তরিত হয়ে দেখা যায়। আমার স্মরণ আছে, আমার শ্রদ্ধেয় পিতা ('গাফারাল্লাহু লাহু) যিনি একজন সম্মানিত রঈস ছিলেন এবং তাঁর এলাকা জুড়ে বিশেষ সম্মানের সাথে সুখ্যাত ছিলেন, তিনি যখন ইন্তেকাল করলেন তখন তাঁর মৃত্যুর পর দ্বিতীয় কি, তৃতীয় দিন আমি স্বপ্নে একজন অতি সুন্দরী মহিলাকে দেখতে পেলাম যার চেহারা বা অবয়ব এখনও আমার দৃষ্টির সামনে রয়েছে–সে বললো, 'আমার নাম রানী'। আর সে ইশারা-ইঙ্গিতে জানালো যে সে এই গৃহের সম্মান ও মর্যাদা বিশেষ। সে আরও বললো, 'আমি চলেই যাচ্ছিলাম কিন্তু তোমার জন্য থেকে গেলাম'।

সে সময়েই আমি একবার স্বপ্নে একজন অত্যন্ত সুপুরুষ ব্যক্তিকে দেখলাম। আমি তাকে বললাম, 'তুমি একজন অদ্ভুত রকম সুন্দর মানুষ!' সে তখন ইঙ্গিতে ব্যক্ত করল, 'আমি তোমার অত্যুজ্জ্বোল ভাগ্য।' এবং 'তুমি একজন অদ্ভুত রকম সুন্দর মানুষ'- তার সম্পর্কে আমার এ কথার উত্তরে সে বলেছিল, 'হ্যাঁ, আমি একজন 'দর্শনি' (তথা তাক লাগানো সুপুরুষ)।' এই কয়েক দিন হলো, একজন যক্ষ্মারুগী-যার মৃত্যু প্রায় ঘনিয়ে এসেছে এমন ব্যক্তি স্বপ্নে দৃষ্টিগোচর হলো। সে আমাকে জানালো যে তার নাম 'দ্বীন-মুহাম্মদ'। আর আমার অন্তরে উদ্রেক করা হলো, এ হচ্ছে মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর ধর্ম যা দৈহিকরূপ ধারণ করে পরিদৃষ্ট হয়েছে। আমি তাকে প্রবোধ দেই যে আমার হাতে সে রোগমুক্ত ও সুস্থ হবে। এমনি ধারায় কখনও পুণ্য বা মন্দ কর্মসমূহও দৈহিক আকার-আকৃতিতে (স্বপ্নে বা কাশ্ফে) দেখা যায়। কবরে আমল সমূহের আকৃতি ধারণ করে পরিদৃষ্ট হওয়া মুসলমানদের সাধারণ বিশ্বাস। এ কারণেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম স্বপ্নসমূহের তা'বির বা ব্যাখ্যায় স্বপ্নে দেখা মানুষদের নাম থেকে প্রায়শ ভালো বা মন্দ ফলাফল নির্ণয় করতেন।

এখন পুনরায় আমরা দামেস্ক-সংশ্লিষ্ট হাদীসের অবশিষ্ট অনুবাদের দিকে ফিরে যাচ্ছি। মহানবী (সা.) বলেন, 'তোমাদের মাঝে যে-ব্যক্তি তাকে অর্থাৎ দাজ্জালকে দেখতে পাবে তার উচিত হবে সে যেন তার সামনে সূরা কাহ্ফের প্রারম্ভিক আয়াত সমূহ পাঠ করে। কেননা এগুলোতে রয়েছে দাজ্জালের ফেৎনা (নৈরাজ্য) থেকে নিরাপত্তা লাভের ব্যবস্থাপত্র। এতে রয়েছে যথাসাধ্য চেষ্টায় 'আসহাবে-কাহ্ফ' (তথা গুহায় আশ্রয় গ্রহণকারীগণ)-এর মতো 'ইস্তিকামাত' বা অবিচল দৃঢ়তা অবলম্বনের দিকে ইঙ্গিত (বা এরই তাগিদ) রয়েছে। কেননা এ আয়াতগুলোতে উল্লিখিত লোকদের 'ইস্তেকামাতে'রই বর্ণনা রয়েছে। তারা প্রতিমা-পূজারী শাসকের অত্যাচারের ভয়ে গুহায় আত্মগোপন করেছিল। (হে আমার বন্ধু ও ভ্রাতৃগণ! এখন তোমরাও এ আয়াতসমূহ পাঠ করো। কেননা বহু সংখ্যক দাজ্জাল তোমাদের সম্মুখে রয়েছে)। অতঃপর 'আল-উম্মি'('নিরক্ষর') মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমার বাবা-মা যার উদ্দেশ্যে কুরবান তিনি বলেন, দাজ্জাল সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যকার রাস্তা দিয়ে বেরুবে এবং ডানে-বাঁয়ে ফ্যাসাদ ও নৈরাজ্য ছড়িয়ে দেবে। (এটিও এক রূপকাশ্রিত বাচনভঙ্গী, যেমন কাশ্ফ বা

দিব্য-দর্শনে সাধারণভাবে রূপকতা ও ঈশারা-ইঙ্গিত থাকে।

এরপর তিনি (সা.) বলেন, ‘হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ! সে সময় তোমাদের অটল-অবিচল থাকতে হবে, যেভাবে ‘আসহাবে কাহ্‌ফ’ অটল-অবিচল ছিল।’ হাদীস বর্ণনাকারী বলেন, (সাহাবা কিরাম জিজ্ঞেস করেন), ‘হে আল্লাহ্‌র রসূল! কত কাল ব্যাপী দাজ্জাল দুনিয়ায় অবস্থান করবে? তিনি (সা.) বলেন, ‘চল্লিশ দিন।’ কিন্তু ‘শারহুস্‌-সুন্নাহ’ গ্রন্থে বর্ণিত আস্‌মা বিন্‌তে-ইয়াযীদের রিওয়ায়াতে রয়েছে, ‘চল্লিশ বছর অবস্থান করবে।’ কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ বর্ণনাগুলোর মাঝে কোনো রকম স্ববিরোধ রয়েছে বলে মনে করা উচিত নয়। চল্লিশ দিন বা বছর বলতে কী বোঝায় -এর প্রকৃত জ্ঞান সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র ওপর সমর্পন করা উচিত।

‘মুসলিম’ বর্ণিত হাদীসটির অবশিষ্ট অনুবাদ হলো, ‘দাজ্জালের এক দিন এক বছরের সমান হবে। আবার একদিন এক মাসের সমান এবং একদিন এক সপ্তাহের সমান। বাকি দিনগুলো সাধারণ দিনের মতো হবে।’ অতঃপর হাদীস বর্ণনাকারী বলেন, আমরা নিবেদন করলাম, ঐ দীর্ঘদিনগুলোতে* কি এক দিনের নামায পড়া যথেষ্ট হবে? তিনি বল্‌লেন, ‘না। বরং তোমরা নামাযের সময়গুলোর পরিমাণ মত আন্দাজ করে নিও।’ (জানা আবশ্যক, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের এ বক্তব্যটি ‘সম্ভাব্যতার ধারায়’ রয়েছে, অর্থাৎ তিনি (সা.) কাশফ-সংশ্লিষ্ট বিষয়টিকে আল্লাহ্‌-নির্ধারিত সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যাপকতর পরিধির প্রেক্ষিতে তথা প্রশ্নকারীর প্রশ্নটিকে বাহ্যিক সাধারণ অবস্থায় ধরে নিয়ে উত্তর দিয়েছেন। নচেৎ, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বুখারীর ৫৫১ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ হযরত আয়েশা সম্পর্কিত হাদীসটিতে স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করেছেন যে, কাশ্‌ফসমূহের তা’বির (ব্যাখ্যা) কখনও তো বাহ্যিকভাবে, আবার কখনও অদৃশ্য অন্যভাবে পূর্ণ হয়ে থাকে। এ নীতিই চলে আসছে। অতএব তিনি যে নামাযসমূহ সেগুলোর সময়ের পরিমাণ আন্দাজ করে আদায় করার কথা বলেছেন–এটি প্রশ্নকারীর অনুধাবন- ক্ষমতা ও সম্ভাব্য উপস্থিত ধারণা অনুযায়ী ‘কাল্লেমুন্‌ নাসা আলা ক্বাদ্‌রি উকুলিহিম’ (অর্থাৎ ‘তোমরা মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির পরিধি ও ধরণ বুঝে কথা বলো’) – এ নীতি অনুযায়ী নির্দেশ দিয়েছেন। নচেৎ, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কোনো কাশ্‌ফ সংক্রান্ত বিষয়কে খোদা তা’লা কর্তৃক বিশেষভাবে (স্পষ্টতঃ) প্রকাশ না করা অবধি কখনও বাহ্যিক (স্থুল) অর্থে সীমাবদ্ধ বলে মনে করতেন না, যেমন কিনা বহু হাদীস থেকেই নবী করীম (সা.)-এর এ নীতি ও পবিত্র রীতিটি প্রমাণিত।

এরপর রিওয়াতকারী বলেন, আমরা নিবেদন করলাম, ‘হে আল্লাহ্‌র রসূল! দাজ্জাল পৃথিবীতে কত দ্রুত বেগে চলবে এবং তার দ্রুত চলার ধরণটি কী হবে? হুযূর (সা.) বলেন, ‘তীব্র বায়ু পরিচালিত মেঘপুঞ্জের ন্যায় দ্রুত ধাবিত হবে।’ অর্থাৎ এক মুহূর্তেই সহস্র-সহস্র মাইল ব্যাপী ঘুরে ফিরবে। আর কোনো জাতির মাঝ দিয়ে অতিক্রম করতঃ নিজ ধর্মের প্রতি তাদের আহ্বান করবে এবং তারা তার প্রতি ঈমান আনলে সে তখন মেঘমালাকে আদেশ দেবে, যেন তাদের জন্য বারিবর্ষণ করে। তেমনি ভাবে সে ভূমিকে তাদের জন্য ফসলাদি উৎপন্ন করতে আদেশ দেবে। (এসবই রূপকাশ্রিত বর্ণনা। সতর্ক থেকো, ধোকা খেও না)। আর তিনি (সা.) আরও বলেন, ‘এতে করে সময়মত বৃষ্টিপাত হওয়ায় সকালে চরতে যাওয়া গবাদি পশু বিকেলে তারা এমন রিষ্ট-পুষ্ট হয়ে ফিরে আসবে যে, পুষ্টতার কারণে তাদের ঘাড় বেড়ে যাবে এবং স্তন দুধে ভরে যাবে এবং অতি ভরা পেটের দরুন উদর টান-টান হয়ে উঠবে।

এরপর দাজ্জাল আরেক জাতির কাছে যাবে এবং নিজের ঈশ্বরত্বে ঈমান আনতে তাদের আহ্বান করবে। কিন্তু তারা তার আহ্বানে সাড়া দেবে না এবং তার প্রতি বিশ্বাসী হবে না। ফলে দাজ্জাল তাদের ওপর বৃষ্টিপাত বন্ধ করে দেবে, আর জমিকে শস্যোৎপদনে নিষেধ করবে। অতএব তারা দুর্বিক্ষ কবলিত হয়ে পড়বে এবং পানাহারের জন্য তাদের কাছে কিছুই থাকবে না।

এরপর দাজ্জাল জনশূন্য অনাবাদি ভূমি বা মরু প্রান্তর অতিক্রম করতে গিয়ে একে এর সব ধন-রত্ন বের করে দিতে বলবে। তার আদেশ দেয়া মাত্র সেখানকার সব রত্ন-ভাণ্ডার তার পেছনে ছুটবে, যেমন মৌমাছিরা তাদের রানী-মৌমাছির পেছনে পেছনে যায়।

এরপর দাজ্জাল ভরপুর যৌবনের অধিকারী এক ব্যক্তিকে ডেকে তলোয়ার দিয়ে তাকে হত্যা করবে এবং তার দুই টুকরো করে তীর নিক্ষেপের দূরত্বে আলাদা-আলাদা ছুঁড়ে দেবে। এরপর তার লাশকে আহ্বান করবে। তখন সে ব্যক্তি জীবিত হয়ে এক উজ্জ্বল উদ্দীপ্ত চেহারা সহ তার সম্মুখে এসে উপস্থিত হবে। কিন্তু সে তার ঈশ্বরত্বকে অস্বীকার করবে। অতএব দাজ্জাল এ ধরণেরই সব বিভ্রান্তিকর কার্যকলাপে লেগে থাকবে। এরই মধ্যে সহসা মরিয়ম-পুত্র মসীহ্‌ আবির্ভূত হবেন। তিনি একটি শুভ্র মিনারার কাছে দামেস্কের পূর্বদিকে অবতীর্ণ হবেন। কিন্তু ইবনে মাজার বর্ণনায় রয়েছে মসীহ্‌ বাইতুল-মুকাদ্দাসে অবতীর্ণ হবেন। আবার কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে, তিনি বায়তুল-মুকাদ্দাস বা দামেস্কে নয় বরং মুসলমানদের সেনাবাহিনীর মাঝে অবতীর্ণ হবেন।

(চলবে)

ভাষান্তর : **মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ**

মুরব্বী সিলসিলাহ্‌ (অব.)

---

* টীকাঃ দীর্ঘদিন বলতে দুঃখ-কষ্টের দিনকেও বোঝায়। কোনো কোনো বিপদ এতো বেদনাদায়ক হয়ে থাকে যে, এক একটি দিন বছরের সমান বলে মনে হয়। কোনো কোনো বিপদ বা কষ্ট এমন হয়ে থাকে যে, একটি দিন একটি মাসের সমান বলে মনে হয়। আবার কোনো সময় বিপদসঙ্কুল একটি দিন এক সপ্তাহের সমান দীর্ঘ বলে প্রতীয়মান হয়। এরপর ধীরে ধীরে ধৈর্যের উন্মেষ ঘটায় সে দীর্ঘদিনগুলোই সাধারণ দিনের মতো মনে হতে আরম্ভ করে। ধৈর্য ধারণকারীদের জন্য অবশেষে এ গুলোকে খাটো করা হয়। মোটকথা, এটি এক রকম রূপকাশ্রিত বর্ণনা। এ সম্পর্কে চিন্তা করুন, প্রকৃতপক্ষে এসব দীর্ঘ দিন এমনই যেমন তিনি (সা.) বলেছিলেন, আমার স্ত্রীদের মাঝে প্রথম তিনি মারা যাবেন যাঁর হাত লম্বা হবে।’ –গ্রন্থাকার

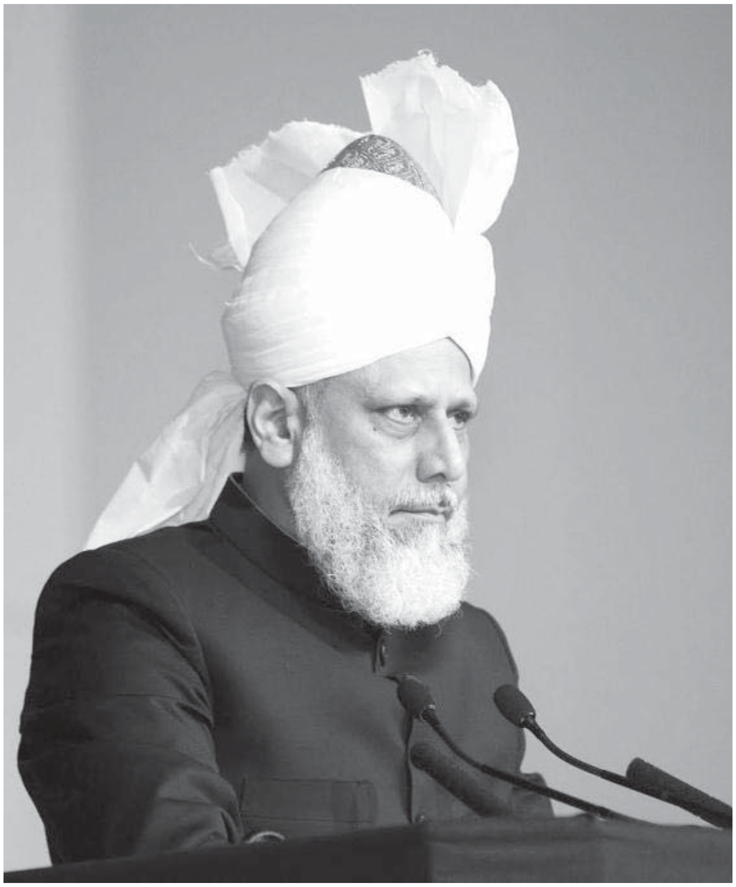

জুমুআর খুতবা

মহানবী (সা.)-এর অনুসরণ ছাড়া মুসলমান হওয়ার দাবি নিরর্থক

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১ জানুয়ারি, ২০১৬ তারিখের জুমুআর খুতবা

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ١ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ٢ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٣ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ٤ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ٥
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ٦ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ٧

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আজ নববর্ষের প্রথম দিন, আর এটি আরম্ভ হচ্ছে জুমুআর আশিসময় দিনের মাধ্যমে। ঐতিহ্যগতভাবে আমরা পরস্পরকে নববর্ষের সূচনাতে শুভেচ্ছা জানিয়ে থাকি। আমাকেও জামাতের বন্ধুদের পক্ষ থেকে নববর্ষের শুভেচ্ছা পাঠানো হচ্ছে। আপনারাও পরস্পরের মাঝে নববর্ষের শুভেচ্ছা বিনিময় করে থাকবেন। পাশ্চাত্যে বা উন্নত আখ্যায়িত হয় এমন দেশসমূহে পুরোনো বছরের শেষ দিনের দিবাগত রাত্রে সারা রাত আনন্দ-উল্লাশ, হৈ-হুল্লোড়, আতশবাজি ফুলঝুড়ি যেটিকে ফায়ার ওয়ার্ক বলা হয়, এসবের মাধ্যমে নববর্ষের সূচনা করা হয় বরং আজকাল মুসলমান বিশ্বেও নববর্ষকে এভাবেই স্বাগত জানানো হয়।

যেমন গতকাল দুবাই থেকে এভাবেই ফুলঝুড়ি বা ফায়ার ওয়ার্কের সংবাদ আসছিল যেখানে এসব তামাশা প্রদর্শিত হওয়ার ছিল আর একই সাথে একটি তেষট্টি তলা ভবনে আগুন লাগার দৃশ্যও দেখানো হচ্ছিল যা পুড়ে ভষ্ম হয়ে যায়। কিন্তু টেলিভিশনে বারবার ঘোষণা করা হচ্ছিল, এই হোটেলে বা এই বিল্ডিংয়ে আগুন লাগলেও কিছু যায় আসে না, এটি পুড়ে গেলে পুড়ুক আমরা তো সেই জায়গার সামনেই বা পাশে, পরিকল্পনা অনুসারে ফুলঝুড়ি অর্থাৎ আতশবাজি বা ফায়ার ওয়ার্ক পরিচালনা করব, আনন্দ উল্লাস হবে।

বর্তমানে মোটের ওপর অধিকাংশ মুসলমান দেশের অবস্থাই শোচনীয়। কিন্তু যাহোক এটি যাদের কাছে টাকা আছে সেসব দেশের মানুষের পক্ষ থেকে বস্তুবাদিতার বহিঃপ্রকাশ। আগুন সেখানে না লাগলেও অবস্থার দাবি ছিল, সম্পদশালী মুসলমান রাষ্ট্রগুলোর এই ঘোষণা দেয়া যে, আমরা এসব বাজে কাজের পিছনে অর্থ অপচয় করার পরিবর্তে সমস্যাকবলিত এবং প্রভাবিত মুসলমানদের সাহায্য করব। কিন্তু এখানে নিজেদের শিক্ষা তারা বেমালুম কীভাবে ভুলে গিয়েছে তা দেখুন! কিছুদিন পূর্বেই দুবাই থেকে এই সংবাদ আসে যে, তাদের সবচেয়ে বড় হোটেলে পৃথিবীর সবচেয়ে ব্যয়বহুল ক্রিসমাস ট্রি রাখা হয়েছে যার মূল্য প্রায় এগার মিলিয়ন

ডলার বা এক কোটি দশ লক্ষ ডলার। এই হলো সম্পদশালী মুসলমান দেশগুলোর অগ্রাধিকার বা প্রবণতা। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহে আহমদীদের অনেকেই এমন আছেন যারা নিজেদের রাত ইবাদতে অতিবাহিত করেছেন বা অনেক স্থানে ভোররাতে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে নফলের মাধ্যমে নববর্ষের প্রথম দিনের সূচনা করেছেন। এছাড়া বহুস্থানে জামাতবদ্ধভাবে তাহাজ্জুদ নামাযও পড়া হয়েছে। কিন্তু এ সবকিছু সত্ত্বেও এসব মুসলমানের দৃষ্টিতে আমরা অ-মুসলমান আর এসব হৈহুল্লোড়কারী ও অপব্যয়কারী এবং অমুসলমানদের সামাজিক কু-প্রথার অন্ধ অনুকরণকারীরা মুসলমান।

যাহোক আমরা আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপায় মুসলমান আর কারো কোন সনদ বা সার্টিফিকেটের আমাদের কোন প্রয়োজন নেই, তবে হ্যাঁ আমরা যদি কোন সনদের বাসনা রাখি তবে তাহলো, খোদার দৃষ্টিতে সত্যিকার মুসলমান হওয়ার সনদ অর্জন করা আর এর জন্য আমরা শুধুমাত্র বছরের প্রথম দিন ব্যক্তিগত বা জামাতবদ্ধভাবে তাহাজ্জুদ পড়লাম বা সদকা করলাম বা অন্য কোন পুণ্য করলাম আর এর মাধ্যমেই আমাদের খোদার সন্তুষ্টি লাভের অধিকার অর্জন হয়ে যাবে, এমনটি নয়। নিঃসন্দেহে এটি পুণ্য। নিঃসন্দেহে এই পুণ্য খোদার কৃপাবারি আকর্ষণের কারণও হতে পারে। কিন্তু তখনই সম্ভব যদি এতে অবিচলতা সৃষ্টি হয়। আল্লাহ্ তা'লা নিজ বান্দার কাছে স্থায়ী পুণ্য চান।

আল্লাহ্ তা'লা চান, বান্দা স্থায়ীভাবে তাঁর নির্দেশাবলী মেনে চলবে, সৎকর্মশীল হবে। নামায এবং তাহাজ্জুদের পাশাপাশি হৃদয়ে এক পবিত্র বিপ্লব আনয়নেরও প্রয়োজন রয়েছে, কেবল তবেই আল্লাহ্ তা'লা সন্তুষ্ট হন। এমন কোন পুণ্য যা শুধু একদিন বা দু'দিন করা হয় তবে তা কোন পুণ্য বা নেকী নয়, তাই আমাদের এটি ভাবতে হবে, আমাদের কর্ম বা আচার-আচরণ কেমন বা কিরূপ হওয়া উচিত যা খোদার সন্তুষ্টির কারণ হতে পারে। এজন্য আজ আমি যুগের সংশোধনের উদ্দেশ্যে প্রেরিত আল্লাহ্ তা'লার প্রেরিত পুরুষের কিছু নসীহত বা উপদেশাবলী নিয়ে এসেছি যা তিনি বিভিন্ন সময় জামাতকে করেছেন যেন অবিচলতার সাথে ও অব্যাহতভাবে আমরা খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করে যেতে পারি। এই কথাগুলো কেবল বছরের প্রথম দিনই নয় বরং বছরের বারো মাস এবং ৩৬৫ দিনকে আশিসমন্ডিত করবে আর আমরা খোদার কৃপাভাজন হতে পারব, খোদার অনুগ্রহ লাভ করতে পারবো। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন,

পৃথিবীর অবস্থা দেখ! আমাদের মহা সম্মানিত রসূল (সা.) নিজ কর্মের দর্পণে এটিই তুলে ধরেছেন যে, আমার জীবন-মরন সবই খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য। অপর দিকে আজ পৃথিবীতে যত মুসলমান রয়েছে তাদের কাউকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে, তুমি কি মুসলমান? তাহলে সে বলে, আলহামদুলিল্লাহ্। যার নামে কলেমা পাঠ করে তাঁর জীবনের সকল নীতি নিবেদিত ছিল খোদা তা'লার সন্তুষ্টির জন্য কিন্তু এরা বস্তু জগতের জন্য জীবন যাপন করে (এরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলে ঠিকই কিন্তু আল্লাহ্র পরিবর্তে বস্তু জগতের জন্য জীবন যাপন করে) আর এর পিছনেই বা এর জন্যই মৃত্যু বরণ করে। তাদের এই অবস্থা ততক্ষণ থাকে যতক্ষণ মৃত্যুর অন্তিম মুহূর্ত না এসে যায়। দুনিয়াই তার উদ্দেশ্য, প্রেমাস্পদ এবং লক্ষ্য হয়ে থাকে।

অতএব এমন পরিস্থিতিতে একথা বলা কীভাবে সত্য-সঠিক সাব্যস্ত হতে পারে যে, আমি মহানবী (সা.)-এর অনুসরণ করি। তিনি বলেন, এটি প্রণিধানযোগ্য একটি বিষয়, এটিকে ভাসা দৃষ্টিতে দেখবে না, মুসলমান হওয়া তত সহজ বিষয় নয়। মুহাম্মদ (সা.)-এর আনুগত্য এবং ইসলামের উত্তম নমুনা যতদিন তোমার মাঝে সৃষ্টি না হবে ততদিন স্বস্তির নিঃশ্বাস নিতে পার না; (যতদিন এটি না হবে) কেবল বাহ্যিকতা বা খোলসই সার। যদি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অনুসরণ ছাড়া মুসলমান হওয়ার দাবি কর অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্র যদি অনুসরণ না কর, কুরআনী শিক্ষার যদি অনুসরণ না কর, তাহলে নাম এবং খোলস নিয়ে আনন্দিত হয়ে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। যদি অনুসরণ না কর তাহলে শুধু ছিলকা বা খোলস নিয়েই তুমি লক্ষঝম্ফ করছো। কোন ইহুদীকে কোন মুসলমান বলে, তুমি মুসলমান হয়ে যাও। সেই ইহুদী বলে, তুমি শুধু নাম নিয়েই সন্তুষ্ট হয়ো না, আমি আমার ছেলের নাম খালিদ রেখেছিলাম কিন্তু সূর্য ডোবার পূর্বেই তাকে কবর দিয়ে দেই। (খালিদের অর্থ হলো, দীর্ঘজীবি হওয়া বা স্থায়ী জীবন লাভ করা কিন্তু নাম রাখার কারণেই সে দীর্ঘজীবন লাভ করেনি, সে তো একদিনও জীবিত থাকতে পারলো না) তাই সত্য সন্ধান কর, শুধু নাম নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবে না। কত লজ্জাস্কর বিষয় যে, মানুষ সুমহান রসূল (সা.)-এর উম্মতী আখ্যায়িত হয়ে কাফিরদের মতো জীবন যাপন করবে। তোমরা নিজেদের জীবনে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উত্তম আদর্শ তুলে ধর এবং সেই অবস্থা সৃষ্টি কর। দেখ! যদি অবস্থা তা না হয় তাহলে তোমরা তাগুত বা শয়তানের অনুসরণ করছ আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করছ।

বস্তুত একথা খুব সহজেই বোধগম্য যে, খোদার প্রেমাস্পদ হওয়াই মানব জীবনের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। কেননা যতদিন খোদার প্রিয় না হবে, খোদার ভালোবাসা লাভ না হবে ততদিন সফল জীবন যাপন করতে পারবে না, আর এরূপ পরিস্থিতি ততক্ষণ সৃষ্টি হবে না যতক্ষণ মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সত্যিকার আনুগত্য ও ইতায়াত না করবে। মহানবী (সা.) ব্যবহারিক দৃষ্টান্তের মাধ্যমে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, ইসলাম কাকে বলে। অতএব তোমরা সেই ইসলাম নিজেদের মাঝে সৃষ্টি কর যেন খোদার প্রিয়ভাজন বা প্রেমাস্পদ হতে পার।

ইসলাম জাগতিক নিয়ামত উপার্জনে বারণ করে না বরং পৃথিবীতে বসবাস করেও ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেয়ার পরামর্শ দেয়। এ সম্পর্কে সৈয়্যদনা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, ইসলাম বৈরাগ্য বা সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করতে বারণ করেছে, এটি ভীরুদের কাজ। এই জগতের সাথে মু'মিনের সম্পর্ক যত ব্যাপকতর হয় ততই তা তার পদমর্যাদা উন্নীত হওয়ার কারণ হয় কেননা; ধর্মই তার মূল লক্ষ্য হয়ে থাকে। এই ইহজগত, এর ধন-সম্পদ ও সম্মান ধর্মের সেবক হয়ে থাকে। আসল কথা হলো, এই বস্তুজগত যেন মূল লক্ষ্য না হয় বরং জাগতিক আয় উপার্জনের মূল উদ্দেশ্যও ধর্ম হওয়া উচিত। অতএব জাগতিক আয়-উপার্জন এমনভাবে করা উচিত যেন তা ধর্মের সেবাদাস বা সেবক হয়। যেভাবে মানুষ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়ার উদ্দেশ্যে সফরের জন্য বাহন এবং পাথেয় সঙ্গে নিলেও তার আসল উদ্দেশ্য সেই বাহন বা পাথেয় নয় বরং গন্তব্যে পৌঁছা হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে মানুষ জাগতিক আয়-উপার্জন করতে পারে কিন্তু একে ধর্মের সেবক বিবেচনা করে করা উচিত।

তিনি (আ.) বলেন,

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً

(সূরা আল্ বাকারা: ২০২)।

আল্লাহ্ তা'লা এই যে,

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً

-র শিক্ষা দিয়েছেন এতেও এই দুনিয়া বা ইহজগতকে অগ্রগণ্য করেছেন কিন্তু কোন দুনিয়াকে? 'হাসানাতুদ্ দুনিয়া'কে, যা পরকালে হাসানাত বা কল্যাণ বয়ে আনবে। (এমন দুনিয়াকে অগ্রগণ্য করেছেন অর্থাৎ সেই দুনিয়া অর্জন কর যা পারলৌকিক কল্যাণের কারণ হবে) এই দোয়ার শিক্ষা থেকে স্পষ্টভাবে বোধগম্য যে, ইহজাগতিক আয় উপার্জনের পিছনে মু'মিনের 'হাসানাতুল আখিরাহ্' অর্থাৎ পারলৌকিক কল্যাণকে অগ্রগণ্য রাখা উচিত। একই সাথে 'হাসানাতুদ্ দুনিয়া' শব্দে জাগতিক আয়-উপার্জনের সেসব উত্তম মাধ্যমগুলো ব্যবহারের কথা এসে গেছে যা জাগতিক আয় উপার্জনের ক্ষেত্রে মু'মিনের অবলম্বন করা উচিত। ইহজাগতিক আয় উপার্জনের জন্য এমন সকল মাধ্যমে কর যা অবলম্বন করলে পুণ্য হয় বা নেকী হয় বা যা উত্তম, এমন কোন নীতি নয় যা কোন মানুষের কষ্টের কারণ হতে পারে আর তা স্বশ্রেণীর মাঝে কোন লজ্জার কারণও যেন না হয়। এমন জাগতিক আয়-উপার্জন অবশ্যই পারলৌকিক পুণ্যে পর্যবসিত হয়। তিনি (আ.) বলেন, এমন জাগতিক আয়-উপার্জন কর যার ফলে কারো যা অন্যের ক্ষতির কারণ না হয়, যা অবলম্বনে স্বশ্রেণীর মাঝে লজ্জিত হতে না হয়। তাহলে তোমাদের এমন জাগতিক কার্যকলাপ পরকালের পুণ্যে পর্যবসিত হবে আর একেই খোদা পছন্দ করেছেন।

তিনি (আ.) আরও বলেন, জাহান্নাম কাকে বলে এটি বুঝতে হবে। এক জাহান্নাম হলো সেটি যার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আল্লাহ্ তা'লা অর্থাৎ মৃত্যুর পরের জাহান্নাম। দ্বিতীয়তঃ এই জীবনও বা ইহজীবনও যদি খোদার সন্তুষ্টির জন্য অতিবাহিত না হয় তাহলে এটিও জাহান্নামই। যদি এতে হাসানাত বা কল্যাণ না থাকে তাহলে এই ইহজীবনও জাহান্নাম হতে পারে। তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা এমন মানুষকে কষ্ট থেকে রক্ষা করার এবং তার সুখের কোন নিশ্চয়তা দেন না বা দায়িত্ব নেন না। তিনি (আ.) বলেন, একথা মনে করো না যে, কোন বাহ্যিক ধন-সম্পদ বা রাজত্ব, সম্মান, অজস্র সন্তান-সন্ততি কোন ব্যক্তির জন্য আরাম বা প্রশান্তি বয়ে আনে আর সে দুনিয়াতেই জান্নাতী হয়ে যায়; মোটেই নয়। সেই প্রশান্তি, সেই স্বস্তি, সেই সুখ যা জান্নাতের নিয়ামতরাজির অন্তর্গত তা এসব কথার মাধ্যমে অর্জন হয় না বরং তা খোদার জন্য জীবিত থাকা এবং মৃত্যু বরণ করার মাধ্যমেই লাভ হতে পারে যার জন্য নবীরা, বিশেষ করে ইব্রাহীম এবং ইয়াকূব (আ.) প্রমুখের এই নসীহতই ছিল যে, 'ফালা তামুতুন্না ইল্লা ওয়া আনতুম মুসলিমুন' (সূরা আল্ বাকারা: ১৩৩)।

জাগতিক ভোগবিলাসও এক ধরণের নোংরা লিপ্সা সৃষ্টি করে চাহিদা ও পিপাসাকে বৃদ্ধি করে। জাগতিক ভোগবিলাস ও জাগতিক আনন্দ এক ধরণের লোভ লিপ্সা সৃষ্টি করে। যেভাবে একটি রোগ হিসাবে পিপাসা বৃদ্ধি পেতে থাকে তদ্রুপে সেই পিপাসাও বাড়ে। তিনি (আ.) বলেন, ইসতিসকার রোগীর মতো তার পিপাসার নিবারণ হয় না এবং এক পর্যায়ে সে ধ্বংস হয়ে যায়। অতএব এই বৃথা কামনা-বাসনা এবং আক্ষেপের অগ্নিও সেই জাহান্নামের অগ্নিরই অন্তর্গত যা মানুষের হৃদয়কে কোনভাবে শান্তি বা প্রশান্তি পেতে দেয় না বরং তাকে দ্বিধা-দ্বন্দ ও ব্যাকুলতার মাঝে দিশেহারা ছেড়ে দেয়। তাই এই বিষয়টি আদৌ যেন আমার বন্ধুদের দৃষ্টির আড়ালে না যায় যে, মানুষ ধন-সম্পদ, নারী বা সন্তান-সন্ততির ভালোবাসায় এবং নেশায় এমন উন্মাদ এবং পাগল যেন না হয়ে যায় যে, তার এবং খোদার মাঝে এক পর্দা এসে যাবে বা দূরত্ব সৃষ্টি হবে এবং আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে।

এরপর তিনি বলেন, আমার হৃদয়ে এই ধারণা জাগ্রত হয়েছে যে, 'আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামিন আর রাহমানির রাহিম' এবং 'মালিকিয়াওমিদ্দিন' থেকে প্রমাণিত যে, মানুষের এই সকল গুণাবলী অবলম্বন করা উচিত। অর্থাৎ সকল গুণাগুণ খোদা তা'লারই যিনি রাব্বুল আলামীন বা বিশ্ব প্রভু-প্রতিপালক অর্থাৎ সকল বিশ্বে যেমন শুক্রানু ও মাংস পিন্ডে তথা সকল বিশ্বে এক কথায় সকল বিশ্বের বা সকল জগতের তিনি প্রভু-প্রতিপালক। এরপর রয়েছে রহমান, রহীম এবং মালিকে ইয়াওমিদ্বীন। ইয়াকা না'বুদু যে বলে এর অর্থ হলো, সেই ইবাদতে রবুবিয়্যত, রহমানিয়্যত এবং মালিকিয়্যত গুণাবলীর প্রতিফলন মানুষের নিজের মাঝে গ্রহণ করা উচিত, (আল্লাহ্ তা'লার এসব গুণাবলী নিজেদের জীবনে ধারণ করা উচিত)। মানুষের পরম দাসত্ব হলো, 'তাখাল্লাকু বিআখলাকিল্লাহ্' অর্থাৎ খোদার রঙে রঙীন হয়ে যাওয়া, সেসব গুণ অবলম্বন করা উচিত। যতক্ষণ এই পর্যায়ে না পৌঁছবে ক্লান্ত বা শ্রান্ত হওয়া উচিত নয়। এরপর এক আকর্ষণ সৃষ্টি হয় যা খোদার ইবাদতের দিকে তাকে আকৃষ্ট করে, (এই অবস্থা বা এই গুণাবলী যদি নিজের মাঝে সৃষ্টি হয় তাহলে খোদার ইবাদতের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হবে। আর খোদার ইবাদতই মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য) আর সেই অবস্থা সৃষ্টি হয় যা 'ওয়া ইয়াফআলুনা মা ইউ'মারুন' (সূরা আন্ নাহল: ৫১) এর অবস্থা (অর্থাৎ মানুষ তখন ফিরিশতাসদৃশ হয়ে যায়)।

জীবনের কোন ভরসা নেই, তাই সবসময় মৃত্যুকে সামনে রাখ বা মৃত্যুকে স্মরণ রাখ, তবেই খোদার নির্দেশ মেনে চলা সম্ভব এবং সেই গুণাবলী অবলম্বন করা সম্ভব, এই বিষয়টি আলোচনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, কেউ জানেনা যে, সে যোহরের পর আসর পর্যন্ত বেঁচে থাকবে কি-না?। অনেক সময় হঠাৎ করে রক্ত সঞ্চালন বন্ধ হয়ে প্রাণ বায়ু বেরিয়ে যায়। অনেক সময় ভালো এবং সুস্থ মানুষও হঠাৎ মারা যায়। একটি ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, মন্ত্রী মুহাম্মদ হাসান খান সাহেব বাহির থেকে হাওয়া খেয়ে আসেন এবং সানন্দে সিঁড়ি মাড়িয়ে উপরে যাচ্ছিলেন। তখন হয়তো সিঁড়ির দু'একটি ধাপই অতিক্রম করে থাকবেন, তখন মাথা ঘুরে উঠে আর তিনি বসে পড়েন। চাকর এসে বলে, আমি কি আপনাকে সাহায্য করব? তিনি বলেন, না। এরপর আরো দু'তিনটি ধাপ অতিক্রম করতেই পুনরায় মাথা ঘুরে উঠে এবং এরই সাথে তার প্রাণ বায়ু বেরিয়ে যায়। একইভাবে তিনি আরেক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেন যিনি হলেন, গোলাম মহিউদ্দিন। তিনি কাশ্মীর কাউন্সিলের মেম্বার। তিনিও হঠাৎ করেই ইহধাম ত্যাগ করেন। এক কথায় মৃত্যু কখন আসবে আমরা জানি না। তাই আবশ্যক হলো, এ সম্পর্কে উদাসীন না হওয়া।

অতএব ধর্মের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন অনেক বড় বিষয় যা মৃত্যু যন্ত্রনার মুখে মানুষকে সফলকাম করে। পবিত্র কুরআনে আছে,

إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ

(সূরা আল্ হাজ্জ্ব: ২)। 'আস্‌সাআতে' বলতে হয়তো কিয়ামতও হবে। আমরা এটি অস্বীকার করবো না কিন্তু এতে মৃত্যু-যন্ত্রণাই বোঝায় কেননা; সেটি পূর্ণ বিচ্ছেদের সময় হয়ে থাকে, মানুষ তখন তার পছন্দনীয় এবং প্রিয় জিনিষ থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে

যায়। হঠাৎ করে তার জীবনে যেন এক বিস্ময়কর ভূমিকম্প এসে যায়। আভ্যন্তরীণ ভাবে যেন কোন গ্যাঁড়াকলে আবদ্ধ থাকে। তাই মানুষের সমূহ সৌভাগ্য মৃত্যুকে স্মরণ রাখার মাঝে নিহিত। যখন মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে, মৃত্যু যন্ত্রণায় যখন কাতর থাকে বা অনুরূপ অবস্থা যখন মানুষের ওপর বিরাজ করে এমন পরিস্থিতিতে আসল বিষয় এটিই অর্থাৎ মৃত্যুকে সামনে রাখা উচিত। তিনি (আ.) বলেন, পরম সৌভাগ্যের বিষয় হলো, মৃত্যুকে তার সামনে রাখা আর ইহজগত এবং ইহজাগতিক বিষয়াদি তার কাছে যেন এতটা প্রিয় না হয় যা শেষ মুহূর্তে বা বিদায়ক্ষণে তার কষ্টের কারণ হতে পারে। আর মৃত্যুর কথা যদি স্মরণ থাকে তাহলে মানুষ সৎকর্ম করারও চেষ্টা করবে। তখন সে বৃথা খেলতামাশার পিছনে সময়ও নষ্ট করবে না আর অর্থও নয় আর অযথা কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য অপব্যয়ও করবে না।

এরপর পবিত্র পরিবর্তন আনয়ন সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন, ধৃষ্ট হয়ো না। ইস্তেগফার এবং দোয়ায় রত হও আর এক পবিত্র পরিবর্তন আনয়ন কর। উদাসীনতা প্রদর্শনের আর সময় নেই। অবাধ্য প্রবৃত্তি মানুষকে মিছে আশা দিয়ে থাকে যে, তোমার জীবন দীর্ঘ হবে। মৃত্যুকে সন্নিকটে জ্ঞান কর। আল্লাহ্ তা'লার পবিত্র সত্তা সত্য। যে অন্যায়ভাবে খোদার প্রাপ্য অন্য কাউকে দেয় সে লাঞ্ছনাকর মৃত্যুর সম্মুখীন হবে। তিনি (আ.) বলেন, যেভাবে সূরা ফাতিহায় তিন শ্রেণীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে এই তিনটির স্বাদই তিনি আস্বাদন করাবেন। এতে যারা শেষে ছিল তারা প্রথমে এসে গেছে অর্থাৎ যাল্লিন। অর্থাৎ যারা যাল্লিন ছিল, সূরা ফাতিহায় যাদের কথা শেষের দিকে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু মুসলমানদের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে তিনি বলেন, তারা প্রথমে এসে গেছে।

তিনি দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন যে, ইসলাম এমন এক ধর্ম ছিল যে, কোন যুগে একজন মুরতাদ হলেও কিয়ামত এসে যেত। আর এখন তাঁর যুগে বিশ লক্ষ মুসলমান ইসলাম ছেড়ে দিয়ে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছে আর ইসলাম পরিত্যাগের কারণে তারা নিজেরা অপবিত্র হয়েছে। অথচ নিজের অপবিত্রতার কথা ভুলে গিয়ে তারা এক পবিত্র সত্তাকে অর্থাৎ মহানবী (সা.)-কে গালি দেয়, তাঁর বিরুদ্ধে কথা বলে। মাগযুব বা কোপগ্রস্ত হওয়ার প্রমাণ দেয়া হচ্ছে প্লেগের মাধ্যমে। প্লেগও একটি আযাব বা শাস্তি। এটি তাদের ওপর নিপতিত হয় যারা খোদার ক্রোধভাজন হয়। আজকের যুগেও তুফান আসছে, ভূমিকম্প দেখা দিচ্ছে এছাড়াও বিভিন্ন প্রকার বিপদাপদ রয়েছে। মানুষ যদি চিন্তা করে তাহলে স্পষ্ট হয় যে, খোদার ক্রোধ বর্ষিত হচ্ছে, গযব নাযিল হচ্ছে আর এই বিষয়গুলোই মানুষকে খোদার দিকে নিয়ে আসে, চেতনাবোধ জাগ্রত করে যে, তার আল্লাহ্‌র দিকে আকৃষ্ট হওয়া উচিত এবং এই গযব থেকে বাঁচার চেষ্টা করা উচিত।

তিনি (আ.) বলেন, এরপর "আন আমতা আলাইহিম"-এর শ্রেণী রয়েছে। এটি খোদার চিরন্তন রীতি, তিনি যখন কোন জাতিকে সম্বোধন করে বলেন, এ কাজ করবে না তখন এর অর্থ দাঁড়ায়, সেই জাতির একটি শ্রেণী খোদার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাবে। কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা যদি বলেন, এই কাজ করবে না তাহলে এর অর্থ হলো এক শ্রেণীর মানুষ অবশ্যই সেই কাজ করবে। আল্লাহ্ তা'লা এখানে সতর্ক করছেন, তোমরা এটি করবে কিন্তু করো না কেননা, করলে এর শাস্তি পাবে। এমন একটি জাতি দেখাও যে জাতিকে বলা হয়েছে, এই কাজ করো না আর তারা তা করেনি। এমন একটি দৃষ্টান্ত দেখাও। কোন জাতিকে যদি বলা হয়, এই কাজ করো না তখন সেই জাতি অবশ্যই সে কাজ করে। আল্লাহ্ তা'লা ইহুদীদের বলেছিলেন, তোমরা বাইবেলে, তওরাতে পরিবর্তন পরিবর্ধন করো না অথচ তারা তা করেছে, তাতে প্রক্ষেপণ করেছে।

কুরআন সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা এই কথা বলেন নি যে, কুরআনে পরিবর্তন পরিবর্ধন করবে না বরং বলেছেন,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ ۝

(সূরা আল্ হিজর:১০)। বস্তুতঃ দোয়ায় নিয়োজিত থাক যেন আল্লাহ্ তা'লা "আন আমতা আলাইহিম" বা পুরস্কারপ্রাপ্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করেন। অতএব পুরস্কারপ্রাপ্তদের শ্রেণীভুক্ত হওয়ার জন্য দোয়ার প্রয়োজন আর কেবল এক দিন বা দু'দিনের দোয়া নয় বরং অনবরত দোয়া করা উচিত।

এরপর পবিত্র পরিবর্তন এবং তাক্বওয়ার ফলশ্রুতিতে পরকালের চিন্তা আসে আর তাক্বওয়াই মানুষকে পরকালে সফল করে বা পরজীবনে সাফল্য বয়ে আনে এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, যারা মুত্তাকী তাদের ওপর খোদার একটি তাজাল্লী বা বিকাশ ঘটে থাকে। তারা খোদার ছায়ায় জীবন যাপন করে। কিন্তু তাক্বওয়া বিশুদ্ধ এবং খাঁটি হওয়া উচিত, শয়তানের কোন অংশ যেন এতে না থাকে। কেননা শিরক বা পৌত্তলিকতা খোদার পছন্দ নয়। যদি কিছুটা অংশ শয়তানের থাকে তাহলে আল্লাহ্ বলেন, পুরোটাই শয়তানের। আল্লাহ্‌র প্রিয়রা যে দুঃখ-যাতনার সম্মুখীন হন তা ঐশী হিকমত এবং প্রজ্ঞার অধীনে হয়ে থাকে। তারা অর্থাৎ খোদার প্রিয়রা কষ্ট পান খোদার বিশেষ হিকমতের অধীনে নতুবা সারা পৃথিবীও যদি জোটবদ্ধ হয়ে যায় তবুও তাদেরকে তারা বিন্দুমাত্র কষ্ট দিতে পারবে না। তারা যেহেতু পৃথিবীতে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য এসে থাকেন তাই মানুষকে খোদার পথে কষ্ট সহ্য করার দৃষ্টান্ত দেখানো তাদের জন্য আবশ্যক হয়ে থাকে। নতুবা আল্লাহ্ তালা বলেন, আমার ওলীর রূহ কবয করার সময় যে দ্বিধাদ্বন্দ হয় এমন দ্বিধাদ্বন্দ আমার অন্য কোন ক্ষেত্রে হয় না। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর ওলী বা বন্ধুর রূহ কবয করা পছন্দ করেন না। আল্লাহ্ তা'লা চান না তাঁর ওলী বা বন্ধুর কোন কষ্ট হোক কিন্তু প্রয়োজনে বা বিশেষ কারণে তাদেরকে দুঃখ দেয়া হয় আর এতে তাদের জন্য পুণ্যই অন্তর্নিহিত থাকে কেননা; এর ফলে তাদের উন্নত নৈতিক চরিত্র প্রকাশ পায়। যখন দুঃখ দেয়া হয় তখন হা-হুতাশ করার পরিবর্তে বা হৈ-চৈ করার পরিবর্তে তাদের উন্নত নৈতিক চরিত্র প্রকাশ করে।

তিনি (আ.) বলেন, নবী এবং ওলীদের কষ্ট এমন নয় যাতে খোদার শাস্তি বা অসন্তুষ্টির বহিঃপ্রকাশ ঘটে থাকে বরং নবীরা বীরত্বের এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। ইসলামের প্রতি খোদার কোন শত্রুতা ছিল না কিন্তু দেখ! উহুদের যুদ্ধে হযরত রসূলে করীম (সা.) নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন। এর মাঝে রহস্য হলো, মহানবী (সা.)-এর বীরত্ব প্রকাশিত হওয়া। অথচ হযরত রসূলে করীম (সা.) দশ হাজার মানুষের মোকাবিলায় একাই দন্ডায়মান হন যে, আমি আল্লাহ্‌র রসূল। অন্য কোন নবীর এমন আদর্শ তুলে ধরার সুযোগ হয়নি। তিনি (আ.) বলেন, আমরা আমাদের জামাতকে বলবো, তারা যেন শুধু এতটুকু নিয়ে গর্বিত না হয় যে, আমরা নামায পড়ি, রোযা রাখি বা বড় বড় অপরাধ যেমন, ব্যভিচার, চুরি ইত্যাদি করি না। তিনি (আ.) বলেন, এসব বৈশিষ্ট্যে অধিকাংশ ভিন ধর্মের মানুষ যেমন মুশরিকরাও তোমাদের মতোই।

অনেক মুশরিক আছে যারা এমন নেকী করে থাকে, তাদের চরিত্রও অনেক উন্নত। তিনি

(আ.) বলেন, তাক্বওয়ার বিষয়টি অতীব সূক্ষ্ম। একে হস্তগত করার চেষ্টা কর বা হস্তগত কর। খোদা তা'লার মাহাত্ম্য হৃদয়ে স্থান দাও। যার কর্মে বিন্দুমাত্র লোক দেখানো ভাব থাকে আল্লাহ্ তা'লা তার কর্ম তার মুখেই ছুড়ে মারেন। মুত্তাকী হওয়া কঠিন বিষয়। উদাহারণস্বরূপ যদি কেউ তোমাকে বলে (তিনি দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন), তুমি কলম চুরি করেছ, তুমি তখন কেন রাগ কর? কেউ যদি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে, এটি ছোট একটি অপবাদ, আমি ঐ কলম এখানে রেখেছি তুমি চুরি করেছ তখন অপরজন এর ফলে রাগ করে। তিনি বলেন, রাগ করার প্রয়োজন কি?

তিনি (আ.) বলেন, তুমি তো তাক্বওয়া অবলম্বন কর বা কলম চুরি করা থেকে বিরত থাক শুধুমাত্র খোদার সন্তুষ্টির জন্য। তোমার যে রাগ হয়েছে তার কারণ হলো, তুমি সত্যমুখী ছিলে না। তুমি যে রাগান্বিত হচ্ছ এর অর্থ হলো, খোদার সাথে তোমার সম্পর্ক ছিল না, আল্লাহ্‌র পবিত্র চেহারার দিকে তোমার দৃষ্টি ছিল না, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি তোমার উদ্দেশ্য ছিল না। তাই অনেকের তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ে রাগ ধরে। যদি খোদার কথা মনে থাকে তাহলে রাগ ধরার কথা নয়। যতক্ষণ মানুষের জীবনে কার্যতঃ অগণিত মৃত্যু না আসে সে মুত্তাকী হয় না। মু'জিযা এবং ইলহামও তাক্বওয়ারই শাখা। একথা স্মরণ রেখো, আসল বিষয় হলো তাক্বওয়া। তাই ইলহাম এবং স্বপ্নের পিছনে ছুটবে না। কারও প্রতি ইলহাম হয় বা রুইয়্যা অর্থাৎ সত্য স্বপ্ন দেখে বা কাশ্‌ফ অর্থাৎ দিব্যদর্শন হয়, এগুলোর পিছনে ছুটবে না বরং সত্যিকার তাক্বওয়া অর্জনের পিছনে ছুটবে। এটি দেখো না যে, কে কি স্বপ্ন দেখছে, বরং এটি দেখ যে, তাক্বওয়া আছে কি না। যে মুত্তাকী হয়ে থাকে তার ইলহামও সত্য হয়ে থাকে। যদি তাক্বওয়া না থাকে তাহলে ইলহামও নির্ভরযোগ্য নয়। যতই কোন ব্যক্তি ইলহাম শোনাতে থাকুক না কেন যদি তার ভেতরে তাক্বওয়া না থাকে, মানুষের অধিকার যদি পদদলিত করে, তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ে ক্ষেপে যায়, সে যতই সত্য স্বপ্ন শোনাক না কেন সেগুলো সত্য নয়।

তিনি (আ.) বলেন, এগুলোতে শয়তানের ভূমিকা থাকতে পারে। কারো তাক্বওয়া তার ইলহামের দৃষ্টিতে যাচাই করো না বরং তার ইলহামকে তার তাক্বওয়ার অবস্থার নিরিখে যাচাই করো। সবদিক থেকে চোখ বন্ধ করে প্রথমে তাক্বওয়ার স্তরগুলো অতিক্রম কর। নবীদের উত্তম আদর্শ সামনে রাখ, যত নবী এসেছেন, সবার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য ছিল তাক্বওয়ার পথ সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা।

اِنْ اَوْلِيَآؤُهٗٓ اِلَّا الْمُتَّقُوْنَ

(সূরা আল্ আনফাল: ৩৫) অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সত্যিকার ওলী বা বন্ধু মুত্তাকী ছাড়া আর কেউ নয় কিন্তু পবিত্র কুরআন তাক্বওয়ার সূক্ষ্ম পথগুলোও বাতলে দেয়। নবীর পরাকাষ্ঠা উম্মতেরও পরাকাষ্ঠার দাবি করে। যেহেতু মহানবী (সা.) খাতামান নবীঈন ছিলেন (সা.), তাই মহানবী (সা.)-এর সত্তায় নবুওয়তের পরাকাষ্ঠা সমাপ্ত হয়েছে। আর এরই সাথে নবুওয়তের সমাপ্তি হয়েছে। যে খোদাকে সন্তুষ্ট করতে চায় এবং নিদর্শন দেখতে চায় এবং অলৌকিক বিষয়াদি দেখতে চায় তার জীবনকেও অলৌকিক জীবনে পরিণত করা উচিত। মহানবী (সা.) খাতামান নবীঈন, তাই খাতামান নবীঈনের মান্যকারীদেরও তাক্বওয়ার সেই মানে উপনীত হওয়া উচিত যা সর্বোচ্চ মার্গ। তিনি (আ.) বলেন, নিজেদের জীবনকে অলৌকিক জীবনে পরিণত কর। দেখ! পরীক্ষার্থী পরিশ্রম করে যক্ষা রোগীর মত দুর্বল হয়ে যায়। পড়াশুনা করতে করতে সেভাবে দুর্বল হয়ে যায় যেভাবে টিবির রোগী হয়ে থাকে।

অতএব তাক্বওয়ার পরীক্ষায় পাশ করার জন্য সকল কষ্ট করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাওয়া উচিত। তাক্বওয়া একটি পরীক্ষা, এর জন্য পরিশ্রম করতে হয়। মানুষ এই পথে যখন পা উঠায় শয়তান তার ওপর বড় বড় আক্রমণ করে, কিন্তু এক পর্যায়ে গিয়ে শয়তান ক্লান্ত হয়ে যায়। এটিই সেই মুহূর্ত যখন মানুষের ইতর জীবনের ওপর মৃত্যু আসে আর সে খোদার ছায়ায় এসে যায়, সে খোদার বিকাশস্থল এবং আল্লাহ্‌র খলীফা হয়ে থাকে। আমাদের শিক্ষার সংক্ষিপ্ত সার হলো, মানুষের সরুদয় শক্তি নিচয়কে খোদার সন্ধানে নিয়োজিত করা উচিত।

তাক্বওয়ার প্রেক্ষাপটে আবারও নসীহত করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, খোদাভীরুদের জন্য শর্ত হলো, নিজেদের জীবন বিনয় এবং দীনতার মাঝে অতিবাহিত করা। এটি তাক্বওয়ার একটি শাখা, যার মাধ্যমে আমাদের অবৈধ রাগ এবং ক্রোধের মোকাবিলা করতে হবে। তাক্বওয়ার মাধ্যমে অনর্থক যে রাগ ধরে আর অনর্থক রাগ-ক্রোধ যদি আমাদের ওপর যদি কারো থেকে থাকে এর মোকাবিলা আমাদের করতে হবে। বড় বড় তত্ত্বজ্ঞানী ও সত্যবাদীর জন্য শেষ এবং কঠিন স্তর হলো ক্রোধ এড়িয়ে চলা। কারো রাগের মোকাবিলায় তুমি স্বয়ং ক্রোধের বশীভূত হবে না।

তিনি (আ.) বলেন, অহংকার আর আত্মশ্লাঘা ক্রোধের কারণেই সৃষ্টি হয় আর কখনও স্বয়ং ক্রোধ বা রাগ, অহংকার এবং আত্মশ্লাঘার কারণ হয়ে থাকে। অর্থাৎ কেউ কিছু বললে হঠাৎ করে মানুষ ক্ষেপে যায়, ক্ষেপার কারণ হলো সেই ব্যক্তি অহংকারী। তিনি (আ.) বলেন, রাগ তখন দেখা দেয় যখন মানুষ নিজেকে অন্যের ওপর প্রাধান্য দেয়। তিনি (আ.) বলেন, আমি চাই না, আমার জামাতভুক্তরা পরস্পরকে ছোট বা বড় জ্ঞান করবে বা একে অন্যের বিরুদ্ধে অহংকার করবে বা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখবে বা কাউকে তুচ্ছ মনে করবে। আল্লাহ্ তা'লাই ভালো জানেন, কে বড় আর কে ছোট। এটি এক প্রকার তাচ্ছিল্যের অভ্যাস। যার ভেতর তাচ্ছিল্যের অভ্যাস থাকে, আশঙ্কা রয়েছে, সেই বীজ বৃদ্ধি পেয়ে তার ধ্বংস ডেকে আনতে পারে। যে নিজেকে কোন অর্থে বড় মনে করে এর অর্থ হলো, অন্যকে সে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখে বা হেয় মনে করে। তিনি কোন অর্থে বলছেন, অন্যকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখা ধ্বংস ডেকে আনে। কেউ কেউ বড়দের সাথে একান্ত ভদ্রতার সাথে ও শ্রদ্ধার সাথে সাক্ষাৎ করে, ধনী ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ হলে সম্মান করে, ভদ্রতার সাথে সাক্ষাৎ করে। কিন্তু বড় সে, যে দীন-হীন ব্যক্তির কথা দীনতার সাথে শোনে, মিসকীন বা দরিদ্র ব্যক্তির কথা দীনতা এবং বিনয়ের সাথে শোনে, মনোযোগের সাথে শোনে, তার মন জয় করে, তার কথার সম্মান করে। কাউকে ক্ষেপানোর জন্য কোন কথা বলা উচিত নয় যার ফলে অন্য কেউ কষ্ট পেতে পারে।

আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ؕ بِئْسَ الْاِسْمُ
الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ
فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

(সূরা আল্ হুজুরাত:১২) তোমরা পরস্পরের এমন নাম রেখো না যা রাগের কারণ হতে পারে, এটি পাপাচারী, দুরাচারী ও

কদাচারিদের কাজ। যে কাউকে ক্ষেপায় সে ততক্ষণ মরবে না যতক্ষণ সে নিজে এতে ক্লিষ্ট না হবে। ভাইদের তুচ্ছ মনে করবে না, একই প্রস্রবণ থেকে যখন সবাই পানি পান কর, কে জানে কার ভাগ্যে বেশি পানি রয়েছে। শ্রদ্ধেয় এবং সন্মানিত কেউ জাগতিক নীতির ভিত্তিতে হয় না, আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে বড় সে, যে মুত্তাকী।

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ
أَتْقٰكُمْ ۚ إِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

(সূরা আল্ হুজুরাত:১৪)।

পুনরায় তাক্বওয়া সম্পর্কে জামাতকে নসীহত করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, (এর বিভিন্ন আঙ্গিক তুলে ধরছেন তিনি) আল্লাহ্ তা'লা যত শক্তি-বৃত্তি দিয়েছেন, যত সামর্থ্য এবং যোগ্যতা মানুষকে দিয়েছেন তা নষ্ট করার জন্য দেয়া হয়নি। এগুলোকে ভারসাম্যের পোষাক পরিধাণ করানো এবং তার বৈধ ব্যবহারই এগুলোকে দৃঢ়তা দেয়ার নামান্তর। সততার সাথে বৈধ স্থানে ব্যবহারই এগুলোকে দৃঢ় করা আর সঠিক ব্যবহারের ফলে এগুলো দৃঢ় হয়, উন্নতি হয়, শক্তি, যোগ্যতা, সামর্থ্য বৃদ্ধি পায়, মানুষ আরও পুণ্য করার শক্তি লাভ করে। এ কারণেই ইসলাম পুরুষত্ব নষ্ট করা বা চোখ উপড়ে ফেলার শিক্ষা দেয়নি বরং সেগুলোর বৈধ ব্যবহার এবং আত্মশুদ্ধি করা শিখিয়েছে। যৌন শক্তি বা চোখ কোন অপকর্ম করার জন্য দেয়া হয়নি। চোখের অন্যায় ব্যবহারের জন্য চোখ দেয়া হয় নি। এসব অঙ্গ বা শক্তি সামর্থ্য দিয়েছেন এই বলে যে, এগুলোর বৈধ ব্যবহার যদি কর তাহলে আত্মশুদ্ধি লাভ হবে, যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'ক্বাদ আফলাহাল মু'মিনুন' (সূরা আল্ মু'মিনুন:২)। অনুরূপভাবে এখানেও শেষের দিকে মুত্তাকীর জীবনের চিত্র অঙ্কন করে উপসংহার স্বরূপ বলেন, 'ওয়া উলাইকা হুমুল মুফলিহুন' (সূরা আল্ ইমরান: ১০৫) অর্থাৎ যারা তাক্বওয়ার পথে বিচরণ করে, অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, তাদের নামায দোদুল্যমান হলেও তারা নামাযকে দাঁড় করায়। মানুষ বলে, নামাযে মনোযোগ থাকে না, অনেকের জীবনে এমন অবস্থাও আসে, দোদুল্যমান হলে নামাযকে দাঁড় করায়।

আল্লাহ্ যা দিয়েছেন তা থেকে আল্লাহ্র পথে খরচ করে। রিপুর তাড়না সত্ত্বেও তারা কোন কিছু চিন্তা না করে অতীত এবং বর্তমান ঐশী গ্রন্থাবলীর ওপর ঈমান আনে আর অবশেষে তারা দৃঢ় বিশ্বাসের পর্যায়ে উপনীত হয়। প্রথমে অদৃশ্যে ঈমান আনে, শেষে অদৃশ্যে বিশ্বাস মানুষকে দৃঢ় বিশ্বাসের পর্যায়ে পৌঁছায়। এরাই হিদায়াতপ্রাপ্ত। তারা এমন এক হিদায়াতের পথে চলে, যা অনবরত এগিয়ে যায়। যারা অনবরত চেষ্টা করে তারা সেই পথে চলে যা হিদায়াতের দিকে নিয়ে যায়, যার মাধ্যমে মানুষ সাফল্য লাভ করে। এরাই সফলকাম, যারা গন্তব্যে পৌঁছে যাবে আর পথের ঝুঁকি থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'লা প্রারম্ভেই তাক্বওয়ার শিক্ষা দিয়ে আমাদের এমন একগ্রন্থ দিয়েছেন যাতে তাক্বওয়া সংক্রান্ত বিভিন্ন নসীহতও করেছেন। এসব কথা বলার পর তিনি বলেন, অতএব এই দুঃখ এবং বেদনা আমাদের জামাতের সমস্ত জাগতিক দুঃখ বেদনার চেয়ে বেশি থাকা উচিত যে, তাদের মাঝে তাক্বওয়া আছে কি না।

এরপর তিনি (আ.) আরেক জায়গায় বলেন, যদি তোমরা চাও, উভয় জগতে সফলকাম হও আর মানুষের হৃদয়ের ওপর বিজয়ী হও, তাহলে পবিত্রতা অবলম্বন কর, বিবেক বুদ্ধি খাটাও, ঐশী গ্রন্থের দিক-নির্দেশনার অনুসরণ কর, নিজেকে সুশৃঙ্খল কর আর অন্যদের উন্নত চরিত্রের নমুনা দেখাও তাহলে অবশেষে সফল হবে। এরপর তিনি (আ.) একটি ফার্সী পঙতি পড়েন যে, কেউ কতই না উত্তম বলেছে যে, "সুখান কায দিল বেরুঁ আয়েদ নাশিনদ লা জারাম বার দিল" অর্থাৎ যে কথা হৃদয় থেকে উদ্ভুত হয় তা অবশ্যই হৃদয়ে আসন গ্রহণ করে। মু'মিনের প্রতিটি কথা হৃদয় থেকে উদ্ভুত হওয়া উচিত এবং অন্যের জন্য সেটি সাফল্যের কারণ হওয়া উচিত এটিই নিজের জন্য সাফল্য বয়ে আনে।

তিনি (আ.) বলেন, প্রথমে নিজের ভেতর হৃদয় সৃষ্টি কর, যদি হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করতে চাও তাহলে ব্যবহারিক শক্তিতে শক্তিমান হও। যদি অন্যদের হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করতে হয় তাহলে প্রথমে নিজের মাঝে ব্যবহারিক শক্তি সৃষ্টি কর। নিজের হৃদয়কে প্রথমে এমন কর যেন তাতে সকল পুণ্য সৃষ্টি হয়। এরপর তা মেনেও চল, কেননা মানা ছাড়া বা আমল ছাড়া মানুষের বক্তৃতা কোন কাজে দেয় না। লক্ষ লক্ষ মানুষ আছে যারা মৌখীকভাবে বুলি আওড়ায়, অনেকে মৌলভী এবং আলেম আখ্যায়িত হয়। মিম্বরে চড়ে নায়েবে রসূল এবং নবীদের ওয়ারিশ হওয়ার দাবী করে আর বক্তৃতা দিয়ে বেড়ায় এবং বলে, অহংকার ও গর্ব ইত্যাদি এড়িয়ে চল কিন্তু তাদের নিজেদের কর্ম এবং তাদের যেই কুকীর্তি এর ধারণা এখেকে করতে পার যে, তাদের এসব কথার কতটা প্রভাব তোমাদের হৃদয়ের ওপর পড়ছে বা তোমাদের হৃদয়কে কতটা প্রভাবিত করছে তাদের কথা।

কথা বলার পূর্বে প্রথমে নিজে আমল কর। এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, এমন মানুষ যদি কর্মশক্তিতে শক্তিমান হতো আর কাউকে বলার আগে যদি নিজে আমল করতো তাহলে কুরআনে 'লিমা তাকুলুনা মা লা তাফআলুন' (সূরা আস্ সাফ: ৩) বলার কি প্রয়োজন ছিল? এই আয়াতই বলছে, পৃথিবীতে বলে না করার বা আমল না করার মানুষ ছিল এবং আছে আর ভবিষ্যতেও হবে। অতএব কুরআনের নির্দেশ যদি মেনে চলতে হয় তাহলে এ সম্পর্কেও ভাবতে হবে। এই নসীহতকেও বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টিতে রাখতে হবে যে, আমাদের উচিত প্রথমে আত্মজিজ্ঞাসা করা আর এই মৌলিক নসীহত বিশেষ করে জামাতের কর্মকর্তাদের স্মরণ রাখা উচিত। যারা আশা করে, অন্যরা নিজেদের মাঝে পরিবর্তন আনবে, নসীহতও করে, কিন্তু পরিস্থিতি দেখা দিলে নিজেদের ক্ষেত্রে তারা উল্টো কাজ করে বা বিভিন্ন বাহানা বা অজুহাত দেখায় এবং আল্লাহ্র বিভিন্ন নির্দেশ বা রসূলের নির্দেশকে গৌণ বিষয় বলে মনে করে। এমন অনেক বিষয় আমার সামনে আসে বিভিন্ন সময়ে।

কথা এবং কর্মের সামঞ্জস্য সম্পর্কে তিনি (আ.) আরো বলেন, তোমরা আমার কথা শোন আর ভালোভাবে হৃদয়ে গেঁথে নাও। যদি মানুষের কথা আন্তরিক না হয়, কর্মশক্তিতে সেটি শক্তিমান না হয়, তাহলে তা প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয় না। এর মাধ্যমেই আমাদের মহানবী (সা.)-এর মহান সত্যতা ফুটে ওঠে, কেননা হৃদয়ে প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে যে সাফল্য তিনি লাভ করেছেন এর কোন দৃষ্টান্ত মানব জাতির ইতিহাসে দেখা যায় না। আর এসব কিছু এ জন্যই হয়েছে যে, তিনি (সা.)-এর কথা এবং কর্মের মাঝে পুরো সামঞ্জস্য ছিল; আর আমাদের জন্য এটিই নির্দেশ, আমরা যেন তাঁর আদর্শ অনুসারে জীবন যাপন করি।

আরেকটি কথার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে যা জামাতের শিক্ষিত শ্রেণী এবং পিতা-মাতার বা যারা উচ্চশিক্ষা অর্জন করছে এমন যুব সমাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ; তিনি (আ.) বলেন, অধুনা শিক্ষিত শ্রেণী যে আরেকটি বড় সমস্যার সন্মুখীন হয় তাহলো, ধর্মীয় জ্ঞানের

সাথে তাদের আদৌ কোন সম্পর্ক নেই। এদিকে পুরো মনোযোগ দেয় না, এরপর যখন কোন বিজ্ঞানী বা কোন দার্শনিকের আপত্তি পাঠ করে তখন তাদের হৃদয়ে ইসলাম সম্পর্কে সন্দেহ এবং কুমন্ত্রণা দেখা দেয়, কোন দার্শনিক বা কোন বিজ্ঞানীর আপত্তি যখনই পাঠ করে খোদা সম্পর্কে বা ধর্ম সম্পর্কে তখন বিভিন্ন সন্দেহ এবং কুমন্ত্রণা হৃদয়ে দানা বাধে, তখন এমন মানুষ খ্রিস্টান বা নাস্তিক হয়ে যায়। তিনি (আ.) বলেন, এমন অবস্থায় তাদের পিতা-মাতাও তাদের ওপর অনেক যুলুম করে, ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের জন্য বিন্দুমাত্র সময় তাদের দেয় না আর শুরু থেকেই জাগতিকতা এবং এমন সমস্যার মুখে ঠেলে দেয় যা তাদেরকে পবিত্র ধর্ম থেকে বঞ্চিত রাখে। তাই পিতা-মাতাকে সন্তানের প্রতি মনোযোগ দেয়া উচিত আর যুবক যুবতীদের স্বয়ং ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের প্রতি মনোযোগ দেয়া উচিত। আহমদীয়া মুসলিম জামাতে আল্লাহ্ তা'লার ফযলে পবিত্র কুরআন, কুরআনের তফসীর এককথায় এত বই পুস্তক রয়েছে যে, সেগুলো যদি পাঠ করা হয় তাহলে সকল আপত্তি ও কুমন্ত্রণা সহজেই দূরীভূত হতে পারে।

এরপর পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ, ঐক্য এবং ভালোবাসা সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন, জামাতের পারস্পরিক ঐক্য এবং ভ্রাতৃত্ববোধ সম্পর্কে আমি বেশ কয়েকবার বলেছি, তোমরা পরস্পর ঐক্য এবং একতা সৃষ্টি কর, আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের এই শিক্ষাই দিয়েছিলেন যে, তোমরা এক সত্ত্বা হয়ে যাও নতুবা তোমাদের প্রভাব, প্রতাপ লোপ পাবে। নামাযে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ানোর নির্দেশ এজন্যই দেয়া হয়েছে যেন পারস্পারিক ঐক্য বজায় থাকে, বৈদ্যুতিক শক্তির ন্যায় কল্যাণ বা মঙ্গল পরস্পরের মাঝে সঞ্চালিত হবে। যদি পরস্পর মতভেদ থাকে, ঐক্য যদি না থাকে, তাহলে দুর্ভাগাই থেকে যাবে। যদি মতভেদ থাকে তাহলে তোমাদের লক্ষ্য অর্জিত হবে না, তাই মতভেদ দূর কর, ঐক্য সৃষ্টি কর।

মহানবী (সা.) বলেছেন, পারস্পরিক ভালোবাসা রাখ। অন্যের অবর্তমানে তার জন্য দোয়া কর। ভালোবাসার দাবি কি? তোমরা জান বা না জান, পরস্পরের জন্য দোয়া কর, কাউকে না জানিয়েই তার জন্য দোয়া কর। যদি এক ব্যক্তি অদৃশ্যে কারো জন্য দোয়া করে তাহলে ফিরিশতা বলে, তোমার জন্যও এমনটিই হোক। অন্যরা জানে না, কে কার জন্য দোয়া করছে কিন্তু এভাবে যদি কেউ করে তাহলে ফিরিশ্‌তা তার জন্য দোয়া করে। তিনি (আ.) বলেন, কত মহান কথা এটি, যদি মানুষের দোয়া গৃহীত না-ও হয়, ফিরিশ্‌তার দোয়া তো গৃহীত হবে। আমি নসীহত করছি এবং বলতে চাই, পরস্পর যেন মতভেদ না থাকে।

তিনি (আ.) বলেন, আমি দু'টো বিষয় নিয়েই এসেছি। প্রধানতঃ আল্লাহ্‌র একত্ববাদ অবলম্বন কর, দ্বিতীয়তঃ পারস্পরিক ভালোবাসা এবং সহানুভূতি প্রকাশ কর। সেই দৃষ্টান্ত স্থাপন কর যা অন্যদের জন্য মু'জিযা। সাহাবীদের মাঝে সত্যতার এই প্রমাণই ছিল,

أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ

(সূরা আলে ইমরান: ১০৪)। স্মরণ রেখো! পারস্পরিক সম্প্রীতি বা প্রীতি একটি মু'জিযা বা নিদর্শন। স্মরণ রেখো, যতক্ষণ তোমাদের প্রত্যেকেই নিজের জন্য যা পছন্দ করে, ভাইয়ের জন্যও যদি তা পছন্দ না করে তাহলে সে আমার জামাতভুক্ত নয়। তিনি (আ.) বলেন, সে সমস্যা এবং বিপদাপদের মাঝে নিমজ্জিত-নিপতিত।

তিনি (আ.) আরো বলেন, আমার সত্তা থেকে এক পুণ্যবান জামাত সৃষ্টি হবে ইনশাআল্লাহ্। পারস্পরিক শত্রুতার কারণ কী? এর কারণ হলো কার্পণ্য, অহংকার এবং আত্মশ্লাঘা আর অন্যায় আবেগ অনুভূতি। তিনি (আ.) বলেন, এমন সবাইকে (তিনি বড় বেদনার সাথে বলেছেন) যারা কার্পণ্য রাখে, অহংকারও রাখে, আত্মশ্লাঘাও রাখে, নিজের আবেগ-অনুভুতিকে যারা নিয়ন্ত্রণ করে না। এমন লোকদের আমি জামাত থেকে পৃথক করে দিব যারা নিজেদের আবেগ অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ এবং ভালোবাসার সাথে জীবন যাপন করতে পারে না। যারা এমন তারা স্মরণ রাখবেন! তারা কয়েক দিনের অতিথি মাত্র। যতদিন পর্যন্ত উত্তম আদর্শ প্রদর্শন না করবে, আমি কারো জন্য আপত্তির লক্ষ্যে পরিণত হতে চাই না।

এমন ব্যক্তি যে আমার জামাতভুক্ত হয়ে আমার ইচ্ছানুসারে চলে না, সে শুষ্ক শাখার ন্যায়, তাকে যদি মালী কেটে ফেলে না দেয়, তাহলে আর কি করবে। সেই শুষ্ক শাখা জীবিত শাখার সাথে থেকে পানি শুষে ঠিকই কিন্তু সেটিকে সবুজ করতে পারে না কিন্তু সেই শাখা অন্য শাখাকেও ধ্বংস করে। অতএব সাবধান থেকো; যে নিজের চিকিৎসা করবে না সে আমার সাথে থাকবে না। বাহ্যতঃ কেউ জানুক বা না জানুক কিন্তু যে ব্যক্তি দুর্বল সে সেসব কথা থেকে কল্যাণ মন্ডিত হবে না বা সেসব দোয়া থেকে অংশ পেতে পারে না যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নিজ জামাতের সদস্যদের জন্য করে গেছেন। তাই এ বিষয়ে সব সময় সবার আত্মজিজ্ঞাসা করা উচিত।

এরপর তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেছেন,

وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ
الَّذِينَ كَفَرُوٓا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ

(সূরা আলে ইমরান:৫৬) এই আশ্বাসপূর্ণ প্রতিশ্রুতি এবং এই আশ্বাসবাণী নাসেরায় জন্মগ্রহণকারী ইবনে মরিয়মকে দেয়া হয়েছিল। অর্থাৎ যারা তোমার অনুসরণ করে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে কিয়ামত পর্যন্ত তাদের জয়যুক্ত রাখব, প্রাধান্য দিব।

তিনি (আ.) বলেন, এ প্রতিশ্রুতি নিঃসন্দেহে ইবনে মরিয়মকেই দেয়া হয়েছিল কিন্তু আমি তোমাদের শুভ সংবাদ দিচ্ছি, ঈসা (আ.)-এর নামে আগমনকারী ইবনে মরিয়মকেও আল্লাহ্ তা'লা একই ভাষায় সম্বোধন করে শুভসংবাদ দিয়েছেন। তিনি (আ.) বলেন, এখন আপনারা চিন্তা করুন, যে আমার সাথে সম্পর্ক রেখে এই মহান প্রতিশ্রুতি এবং শুভসংবাদ থেকে অংশ পেতে চায় এমন মানুষ কি সেসব লোক হতে পারে যারা রিপুর তাড়নার স্বীকার, যারা অনাচার, কদাচারে লিপ্ত? মোটেই নয়। যারা খোদার এই সত্য প্রতিশ্রুতির মূল্যায়ন করে তারা আমার কথাকে কল্প-কাহিনী মনে করে না।

তাই স্মরণ রেখো এবং মনোযোগ দিয়ে শোনো, আমি পুনরায় সম্বোধন করে বলছি, যারা আমার সাথে সম্পর্ক রাখে আর সেই সম্পর্ক কোন সামান্য সম্পর্ক নয় বরং অসাধারণ সম্পর্ক আর সেটি এমন সম্পর্ক যার প্রভাব শুধু আমার সত্তা পর্যন্ত নয় বরং সেই সত্তা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে যিনি আমাকে সেই মনোনীত মানবের উৎকর্ষ সত্তা পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন যিনি পৃথিবীতে সত্য এবং তাক্বওয়ার প্রেরণা নিয়ে এসেছেন। আমি এটিই বলব, এসব কথার প্রভাব যদি আমার সত্তা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকতো তাহলে আমার কোন আশঙ্কা বা চিন্তা ছিল

না, আমি ভ্রুক্ষেপও করতাম না কিন্তু কথা এখানেই শেষ নয়, এর প্রভাব আমাদের নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বরং স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লার মহাসম্মানিত সত্তা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে।

অতএব এমন পরিস্থিতে আর এমন অবস্থায় মনোযোগ সহকারে শোন, এই শুভ সংবাদ থেকে যদি অংশ পেতে চাও আর যদি নিজের মাঝে এর সত্যায়নস্থল হওয়ার বাসনা রাখ আর এত বড় সফলতা অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত কাফিরদের বিরুদ্ধে জয়যুক্ত হবে, এর জন্য যদি প্রকৃত পিপাসা তোমাদের মাঝে থাকে তাহলে এটিই বলবো, এই সাফল্য ততক্ষণ অর্জিত হবে না যতক্ষণ সমালোচনাকারী আত্মার স্তর থেকে শান্তিপ্রাপ্ত আত্মার পর্যায় না পৌঁছাও। এর বেশি আমি আর কিছুই বলবো না যে, তোমরা এমন এক ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক রাখ, যিনি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রত্যাদিষ্ট, তাই তাঁর কথা হৃদয় কর্ণে শ্রবণ কর আর এর ওপর আমল করার জন্য সর্বান্তঃকরণে প্রস্তুত হয়ে যাও যেন সেসব লোকের অন্তর্ভুক্ত না হও যারা গ্রহণের পর অস্বীকারের নোংরামীতে লিপ্ত হয়ে চিরস্থায়ী আযাবের শিকার হয়।

এরপর দোয়া গৃহীত হওয়ার শর্ত সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন, এই কথাও মনোযোগ সহকারে শোনা উচিত, দোয়া গৃহীত হওয়ারও কিছু শর্ত রয়েছে, কতিপয় প্রার্থনাকারীর সাথে সম্পর্ক রাখে আর কিছু যে দোয়া করায় তার সাথে সম্পর্ক রাখে। দোয়া যে করায় তার জন্য আবশ্যক হলো, খোদাভীতি এবং খোদার ভয়কে সামনে রাখা। তার ব্যক্তিগত আত্মাভিমানকে সব সময় ভয় করা আর মিমাংশা ও খোদার ইবাদতকে তার রীতি-নীতি হিসেবে রাখা, তাক্বওয়া এবং সততার সাথে খোদাকে সন্তুষ্ট করা। এমন পরিস্থিতিতেই দোয়া গৃহীত হওয়ার দ্বার খোলা হয়। যদি সে খোদা তা'লাকে অসন্তুষ্ট করে, খোদার সাথে যদি সম্পর্ক নষ্ট করে এবং যুদ্ধে লিপ্ত হয় তাহলে তার দুষ্কৃতি এবং অপকর্ম দোয়ার পথে এক প্রতিবন্ধক দেয়াল হয়ে যায় এবং দোয়া গৃহীত হওয়ার দ্বার তার জন্য রুদ্ধ হয়ে যায়। অতএব আমাদের বন্ধুদের জন্য আবশ্যক হলো, আমাদের দোয়া নষ্ট হওয়া থেকে যেন তারা রক্ষা করে এবং দোয়া গৃহীত হওয়ার পথে যেন কোন বাধ না সাধে যা তাদের অসৌজন্যমূলক আচার-আচরণের ফলে সৃষ্টি হতে পারে।

তিনি (আ.) বলেন, তাদের তাক্বওয়ার পথ অবলম্বন করা উচিত কেননা; তাক্বওয়াই এমন একটি বিষয় যাকে শরীয়তের সার বা মূল বলা যায়। আর শরীয়ত যদি কেউ সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করতে চায় তাহলে শরীয়তের মগজ বা প্রাণ হলো তাক্বওয়া। তাক্বওয়ার বহু স্তর রয়েছে কিন্তু সত্যসন্ধানী হিসেবে প্রাথমিক স্তরকে যদি নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার সাথে অতিক্রম করে তাহলে সে সেই সততা এবং নিষ্ঠার কারণে মহান পদমর্যাদায় পৌঁছে যায়। আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ

(সূরা আল্ মায়েদা:২৮) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা মুত্তাকীদের দোয়া গ্রহণ করেন। যেন এটি তাঁর প্রতিশ্রুতি আর আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতির ব্যত্যয় হয় না, যেমনটি তিনি নিজেই বলেন,

إِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ

(সূরা আর্ রা'দ: ৩২)।

অতএব যেখানে দোয়া গৃহীত হওয়ার জন্য তাক্বওয়ার শর্ত এক আশ্যকীয় শর্ত, তাই একজন মানুষ উদাসীন এবং পথহারা হয়ে যদি চায় যে, তার দোয়া গৃহীত হোক তাহলে সে কি আহাম্মক এবং নির্বোধ নয়। অতএব আমাদের জামাতের জন্য আবশ্যক হলো, যথাসাধ্য তাদের সবার তাক্বওয়ার পথে চলা যেন দোয়া গৃহীত হওয়ার স্বাদ এবং আনন্দ পায় আর তার ঈমান বৃদ্ধি ঘটে।

তিনি (আ.) বলেন, একথা মনে করো না যে, শুধু বয়আত করলেই খোদা সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। এটি হলো শুধু ছিলকা বা খোলস, মগজ বা প্রাণ থাকে ভেতরে । বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রকৃতির নিয়ম হলো, বাইরে একটি ছিলকা বা খোলস থাকে আর মগজ থাকে ভেতরে। খোলস কোন কাজের নয়, আসল বিষয় হলো, সার বা মগজ। অনেকেই এমন রয়েছে যাদের মাঝে সার বলতে কিছুই থাকে না আর মুরগির ফাকা ডিমের মত যাতে সাদা অংশও নেই আর কুসুমও নেই, যা কোন কাজের নয়, এগুলো পরিত্যাজ্য বস্তুর ন্যায় ফেলে দেয়া হয়। হ্যাঁ, দু'এক মিনিটের জন্য কোন বাচ্চার খেলার সামগ্রী হিসেবে হয়তো কাজ দিতে পারে। অনুরূপভাবে সেই মানুষ যে বয়আত এবং ঈমান আনার দাবি করে, যদি এই উভয় কথার মগজ নিজের মাঝে না রাখে তাহলে তার ভয় করা উচিত, একটি সময় আসবে যখন সে সেই ফাকা ডিমের মত টুকরো টুকরো হয়ে নিক্ষিপ্ত হবে।

তিনি (আ.) বলেন, অনুরূপভাবে যারা বয়আত এবং ঈমান আনার দাবি করে তাদের আত্মজিজ্ঞাসা করা উচিত, আমি কি শুধু খোলস নাকি আমার ভেতর কোন প্রাণের স্পন্দনও আছে, যদি এটি সৃষ্টি না হয় তাহলে ঈমান, ভালোবাসা, আনুগত্য, বয়আত, ভালবাসা শীষ্যত্ব এবং ইসলাম গ্রহণের দাবিকারক সত্যিকার দাবিকারক নয়। তিনি (আ.) বলেন, এটি সত্য কথা যে, আল্লাহ্‌র দরবারে মগজ ছাড়া বা শাঁস ছাড়া ছিলকার কোন মূল্য নেই। স্মরণ রেখো, জানা নেই মৃত্যু কখন আসবে কিন্তু এটি নিশ্চিত যে, মৃত্যু অবশ্যই আসবে। অতএব নিছক দাবির ওপর নির্ভর করো না আর আনন্দিতও হয়ো না। এটি মোটেই কল্যাণকর বিষয় গণ্য হতে পারে না। যতক্ষণ মানুষ নিজের ওপর অগণিত মৃত্যু আনয়ন না করবে এবং অগণিত পরিবর্তন নিজের মাঝে না আনবে, এমন মানুষ মানব জীবনের আসল লক্ষ্য অর্জন করতে পারে না।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের তৌফিক দিন, আমরা যেন আমাদের জীবন তিনি (আ.)-এর বাসনা অনুসারে, ইচ্ছানুসারে পরিবর্তন করতে পারি আর আমাদের পদচারণা যেন প্রতিটি মুহূর্ত পুণ্যের পানে হয়। আমরা যেন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দোয়া নষ্ট না করি বরং সেসব দোয়া যা তিনি (আ.) তাঁর জামাতের জন্য করে গেছেন সেসবের যেন সব সময় উত্তরাধিকারী হতে পারি, এই দোয়ার মাধ্যমে আপনাদের সবাইকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আল্লাহ্ তা'লা এই বছরকে আমাদের জন্য ব্যক্তিগতভাবে এবং সমষ্টিগতভাবেও অশেষ কল্যাণের কারণ করুন।

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনূদিত।

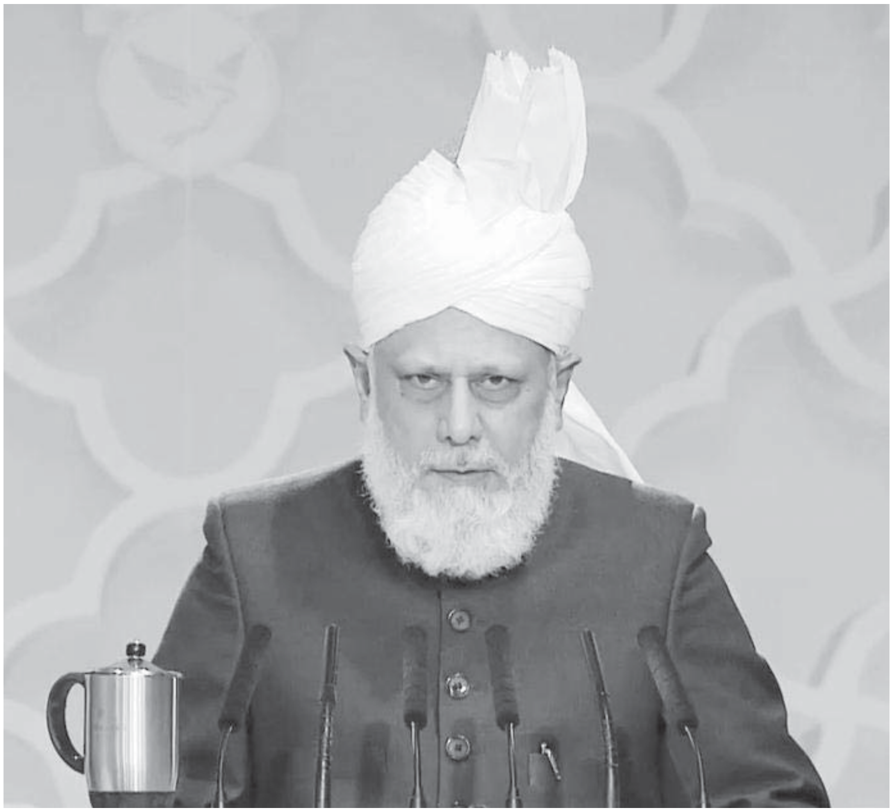

ইসলাম আহমদীয়াত-এর ৫ম খিলাফত প্রদীপ্ত সত্যতায় উদ্ভাসিত

মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ

সত্য খিলাফত ঐশী সাহায্য-সমর্থন ও নিদর্শনে সমৃদ্ধিলাভ করে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে:

আল্লাহ্ তা’লা এক-অদ্বিতীয় চিরঞ্জীব সত্তা। তাঁর জীবিত থাকার প্রামাণিক এক স্বাক্ষ্য হল তাঁর প্রতিষ্ঠিত খিলাফত সচল থাকা আর আয়াতে ‘ইস্তেখেলাফ’-এ (সূরা নূর: ৫৬) মু’মিনদেরকে আল্লাহ্ তা’লার দেয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠিত থাকার এই প্রতিশ্রুতি সদা দৃশ্যমান। চক্ষুষ্মান ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা অবশ্যই তা অনুধাবনে সক্ষম।

আমরা কৃতজ্ঞতা আদায় করি মহান আল্লাহ্‌র, হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহেস সালাম পরলোকগমনের পর তার প্রতিষ্ঠিত মু’মিনদের এই জামা’তে শতাধিক বছরকাল ধরে আল্লাহ্ তা’লা খিলাফত প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন, আলহামদুলিল্লাহ্। আমরা আল্লাহ্‌র সমীপে সকাতরে এই নিবেদন জানাই যে, তিনি আমাদের মাথার ওপর খিলাফতের এই ছায়া কেয়ামতকাল পর্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী করুন।

খিলাফত সম্পর্কে আল্লাহ্ তা’লা সত্য সাধকগণকে আগাম জানিয়ে থাকেন আর পরবর্তীতে সেই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভ করায় তা এক দিকে যেমন আল্লাহ্ তা’লার অস্তিত্বের এক অকাট্য দলিলে পরিণত হয় তেমনি খলীফার পবিত্র ব্যক্তিসত্ত্বাও আল্লাহ্ তা’লার প্রত্যাদিষ্ট ও প্রতিশ্রুত খিলাফতের জীবন্ত এক নিদর্শন সাব্যস্ত হোন আর তা প্রত্যক্ষ করে মু’মিনদের ঈমান সুদৃঢ় হয়ে থাকে।

আমরা নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত, পর্যায়ক্রমে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত থাকার আর বর্তমানে আশিসমণ্ডিত পঞ্চম এই খিলাফতকালে সেই দৃশ্যেরই বাস্তব সাক্ষীরূপে দণ্ডায়মান রয়েছি।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাহাবাগণের রুই’য়ার (সত্য স্বপ্নের) আলোকে আহমদীয়া খিলাফত

খিলাফত সম্পর্কীত ভবিষ্যদ্বাণীর চলমান ধারাবাহিকতা সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাহাবাগণও বহু সত্য স্বপ্ন দেখেছেন। তাদের দেখা সত্য স্বপ্নে, হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এবং হযরত মির্যা শরীফ আহমদ (রা.)-এর সন্তানদের মধ্যে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর স্থলাভিষিক্ত খলীফাগণের জন্মলাভ করার শুভ সংবাদও রয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছেন হযরত মৌলভী আব্দুস সাত্তার সাহেব (রা.), আফগানিস্তানের খোসত নিবাসী এই সাহাবী আহমদীয়াতের প্রথম শাহাদাত বরণকারী আফগানিস্তানের প্রখ্যাত আলেম যার হাতে মুকুট পরিয়ে আফগানিস্তানের বাদশাহ্‌দের অভিষেক অনুষ্ঠান হত, সেই প্রখ্যাত আলেম হযরত সাহেবজাদা আব্দুল লতীফ সাহেবেরই এক বিশেষ শিষ্য ছিলেন এই সাত্তার সাহেব। তিনি (সাত্তার সাহেব) বর্ণনা করেন, খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল অর্থাৎ আহমদীয়াতের প্রথম খেলাফতকালে তিনি স্বপ্নে দেখেন মিয়া মাহমুদ ও শরীফ আহমদ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাম্রাজ্যের হবু সম্রাট। (আল ফযল, ২৫ মার্চ, ১৯১৪, পৃ: ৫)

১৯৪৪ ঈসাব্দে মুসলেহ্ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা সম্পর্কে, আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের দ্বিতীয় খলীফা হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.) এর নিজ ব্যক্তিসত্ত্বায় তা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হওয়ার ঘোষণা প্রদান করেন। এই প্রসঙ্গে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাহাবী মরুহুম মওলানা গোলাম রসূল রাজেকী সাহেব হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) সমীপে তিনটি রুই’য়া লিখে জানান। তার একটি রুই’য়ায় তিনি লিখেন, দ্বিতীয় স্বপ্নটি গত পরশু রাতে দেখেছি। দারুল আমান কাদিয়ানের সকল অধিবাসী এক ‘বড় উৎসব’ এর প্রস্তুতি নিচ্ছে। বিরাট সমাবেশস্থলের সভা-মঞ্চে এক টেবিল পেতে রাখা হয়েছে, যার দক্ষিণ দিকে হুযূর স্বয়ং অর্থাৎ সৈয়্যদনা মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) উপবিষ্ট আছেন আর পূর্ব দিকে বসা রয়েছেন মিয়া শরীফ আহমদ সাহেব। এই দুই সম্মানিত মহোদয়ের চেহারা অভূতপূর্ব

জ্যোতির্ময় দেখাচ্ছিল। ঐ সময়ে দেখলাম, হযরত মিয়া শরীফ আহমদ সাহেব নি:সংঙ্কোচে হাত নেড়ে হুযূরের সাথে আলাপচারিতা করছেন। আর এটা দেখার সাথেই আমি জেগে উঠলাম। (হায়াতে কুদ্দুসী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৩২)

লক্ষণীয় হলো, আহমদীয়া খিলাফতের ধারাবাহিকতায় ৩য় খলীফা হযরত মির্যা নাসের আহমদ (রাহে.) ও ৪র্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) হলেন হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.) এর পুত্র আর ৫ম খলীফা হচ্ছেন হযরত মির্যা শরীফ আহমদ (রা.) এর পৌত্র হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)।

আরব জনপদে আহমদীয়াতের বিস্তার

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর নিম্নের রুই'য়াটি ৫ম খিলাফতকালে আরব জনপদে আহমদীয়াত বিস্তার লাভের সুসংবাদ প্রদান করছে।

২৩ নভেম্বর ১৯৪৫ ঈসাব্দে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) জুমুআর খুতবায় বলেন, "তিন চার দিন হল আমি এক রুই'য়ায় দেখলাম আরব অঞ্চলে আমি এক মোটর গাড়ী যোগে ভ্রমণ করছি। আমার এই ভ্রমণে আমার সাথে আরো একটি মোটর গাড়ীও ছিল, যা ছিল সম্ভবত মিয়া শরীফ আহমদ সাহেবের। এলাকাটি ছিল পাহাড়ী আর কিছু উঁচু টিলাও দেখা যাচ্ছিল, যেমনটি দেখা যায় কাশ্মিরের পেহেলগামে বা পালামপুরে। এক জায়গায় গিয়ে অপর মোটর গাড়ী যেটি মিয়া শরীফ আহমদ সাহেবের বলে আমি ভেবেছিলাম তা অন্য এক দিকে চলে গেল আর আমি গেলাম ভিন্ন আরেক পথে। এমন মনে হচ্ছিল যে, আমার মোটর গাড়ীটি ডাক-বাংলোর দিকে যাচ্ছে। বাংলোয় পৌঁছে মোটর গাড়ী থেকে নামার পর দেখি বহু আরববাসী যাদের মধ্যে কেউ ছিল শ্যামলা আবার কেউ ফর্সাও ছিল, তারা আমার দিকে এগিয়ে আসছিল, আর আমি আমার সফর সঙ্গীদের কাছে যেতে চাইছিলাম, কিন্তু ঐ আরবরা আমার কাছে আসতে না আসতেই আমাকে সম্বোধন করে বলল, **'আস্‌সালামু আলাইকুম ইয়া সাইয়্যেদী'** আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনারা কোথা থেকে এসেছেন? জবাবে তারা বলল, (আমরা আরব জনপদ থেকে এসেছি ও) আমরা কাদিয়ানে গিয়েছিলাম আর সেখানে গিয়ে জানতে পারলাম আপনি বের হয়ে গিয়েছেন আর আমরা আপনার পিছু নিয়ে এ পর্যন্ত এসেছি আর আমরা বুঝতে পারলাম যে, আপনি এখানেই আছেন।

এরপর আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম, কি উদ্দেশ্যে আপনারা এসেছেন? এতে তাদের নেতা উত্তরে বলল, 'আমরা সঠিক শিক্ষা পেতে এসেছি এর সাথে সম্ভবত রাজনীতির পরিভাষায় আরো একটি শব্দ বলেছিল, এরপর আমি ডাক বাংলোর দিকে মোড় নেই আর তাদেরকে বলি ঘরে আসুন, সেখানে পরামর্শ করব। আমি কক্ষে প্রবেশ করতেই দেখি টেবিলের ওপর খাবার পরিবেশন করা আছে, চেয়ারও লাগানো আছে, আমার ধারণা হল হয়তো কোন ইংরেজ ভ্রমণকারী এসেছে, তার জন্যই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। এরপর আমি পরবর্তী কক্ষে গেলাম। সেখানে খাবারের জন্য বিছানা পাতা আছে, কিছু ফল আর মিষ্টি প্লেটে পরিবেশন করা হয়েছে আর চারদিকে রাখা হয়েছে বসার জায়গা, সাধারণত আরবদের গৃহে যেমনটি করা হয়ে থাকে। আমি তাদেরকে সেখানে বসতে বললাম, আর মনে মনে ভাবলাম যে, আমাদের জন্যই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। ঐ লোকেরা সেখানে বসে পরিবেশনকৃত ফলের দিকে হাত বাড়াল এই অবস্থায় আমি জেগে উঠলাম। এই রুই'য়া থেকে আমি মনে করি আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে আরব জনপদে আহমদীয়াতের বিস্তারে উন্নতির দরজা উন্মুক্ত হতে যাচ্ছে"। (আল ফযল, ১৭ ডিসেম্বর, ১৯৪৫)

এ থেকে প্রতীয়মান হয় হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) রুই'য়ায় হযরত মির্যা শরীফ আহমদ সাহেবকে সফর সঙ্গী হিসেবে দেখা প্রকৃত পক্ষে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেসকে নির্দেশ করছে। হযরত মির্যা শরীফ আহমদ সাহেবের মোটর গাড়ী ভিন্ন পথে যাওয়া নির্দেশ করছে যে, এই দুই খিলাফতের তবলীগ পদ্ধতি ভিন্ন হবে। অর্থাৎ খিলাফতে খামেসা বা ৫ম খিলাফতকালে তবলীগ কার্যক্রম ভিন্ন পদ্ধতি অর্থাৎ এমটিএ-এর মাধ্যমে পরিবর্তীত এক রূপ পাবে। আরবরা হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর সাথে কাদিয়ানে সাক্ষাৎ করতে পারে নাই বরং অন্যত্র সাক্ষাৎ লাভ করেছে। অর্থাৎ বাস্তবতা হল এটাই যে, আরবে আহমদীয়াতের বিস্তারকালে খলীফাতুল মসীহ্ ভিন্ন স্থান অর্থাৎ লন্ডনে অবস্থানরত থাকবেন। এই জন্যই রুই'য়ায় খাদ্য পরিবেশনের টেবিলের উল্লেখে ইংরেজদের কথা এসেছে। আর আরবরা হাত বাড়িয়ে ফল নেয়ার অর্থ আরবরা বর্ধিত সংখ্যায় বয়আত গ্রহণ করবে, ইনশাআল্লাহ্।

মনসুরের মাধ্যমে অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় বর্ধিত শক্তি সঞ্চয়

একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে সৈয়্যদনা হযরত আলী মুর্তজা (রা.) মহানবী (সা.)-কে উদ্দেশ্য করে নিবেদন করলেন, নদীর ওপার থেকে এক ব্যক্তি আবির্ভূত হবেন, বিত্ত ও মহানুভবতার কারণে যাকে হারেয বিন হারায আখ্যায়ীত করা হবে। অর্থাৎ অর্থ-বিত্তের দিক থেকে তিনি জমিদার হবেন তার সেনাদলের এক সরদারের নাম হবে মনসুর। আর এই মনসুরের মাধ্যমে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে আর শক্তি বৃদ্ধি পাবে। এবং তাকে সাহায্য করা প্রত্যেক মু'মিনের ওপর ওয়াজেব (আবশ্যকীয়) হবে। (আবু দাউদ, কিতাবুল মাহদী, হাদীস নং ৩৭৩৯)

খোদা তা'লার নিদর্শন লক্ষ্য করুন। সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর পিতার প্রকৃত নাম হচ্ছে সাহেবযাদা মির্যা মনসুর আহমদ। কোন নাস্তিক এটাকে কাকতালিয় ভাবতে পারে। তবে হযরত মির্যা মনসুর আহমদ সাহেবকে হারিসে হারাস অর্থাৎ ভূস্বামী বা কৃষি জমির মালিক হিসেবে ভাববার মত কোন কারণ নেই। তবে খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ সাহেব স্বয়ং ১৯৭৬ সালে ফয়সালাবাদ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃষি-অর্থনীতির ওপর এমএসসি ডিগ্রি অর্জন করেন আর খেলাফতে আসীন হওয়ার পূর্বে (১৯৭৭-১৯৮৫) পর্যন্ত ঘানার উত্তরাঞ্চলের টুবায় আহমদীয়া কৃষি খামারে ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করেছেন আর তিনি হলেন সেই মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী, যিনি আফ্রিকা অঞ্চলের ঘানায় প্রথম বারের মত সফলতার সাথে গম চাষ করতে সক্ষম হোন এবং উক্ত অঞ্চলে গম-চাষ-এর পথিকৃত তিনি। (আল ফযল, ৩ ডিসেম্বর, ২০০৮)

উপরোক্ত বিষয় থেকে সুস্পষ্ট হয় যে, আবু

দাউদে বর্ণিত জমিদার বা ভূস্বামী হিসেবে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীটি হযরত মির্যা মাসরূর আহমদের ব্যক্তিসত্ত্বায় কতইনা স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর রুই'য়া

১৯৮৭ সালের ৮ মে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) বলেন, কয়েক দিন পূর্বে আমি অদ্ভুত এক স্বপ্ন দেখেছি। স্বপ্নে দেখি হযরত বু জয়নব চাচিজান হযরত ছোট চাচা জানের সহধর্মীণী সাহেবা মরহুমা যিনি সাহেবযাদা মির্যা মনসুর আহমদ সাহেবের মাতা ছিলেন, তিনি এসেছেন পূর্বে তো কখনও আমি তাকে স্বপ্নে দেখি নাই, সম্ভবত একবার তাকে দেখেছি, তিনি এলেন উচ্চতায় বেশ বড়-সর, দেখতেও তিনি যেমনটি ছিলেন, তার তুলনায় তাকে অনেক বেশি সুশ্রী দেখাচ্ছিল। তিনি এগিয়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরছিলেন তবে জড়িয়ে নিয়েই আবার পিছিয়ে যাচ্ছিলেন, কথাবার্তা যদিও বলেন নাই কিন্তু আমাকে বুঝাচ্ছিলেন যে, আমি নিজে থেকে সাক্ষাতের জন্য আসিনি বরং সাক্ষাত করিয়ে দিতে এসেছি। এর বেশ কিছু সময় পর তাঁবু থেকে হযরত ফুপি জান বেরিয়ে এলেন, সম্ভবত যে, তিনি (চাচি জান) তাকে (ফুপি জানকে) সাক্ষাত করিয়ে দেয়ার জন্য এসেছিলেন।

স্বপ্নে দেখা দৃশ্যটি এমন যে, না কোন কথা বার্তা হল আর না ডানে বায়ে ভিন্ন কোন দৃশ্য দেখা গেল। কেবলমাত্র তাঁবু থেকে তিনি (ফুপিজান) বেরিয়ে এলেন। খুবই সুন্দর পোশাক পরিহিতা ছিলেন, সাস্থ্যেও ভাল, তিনি যখন গলায় জড়িয়ে নিলেন, এতই আদর সোহাগ ও মমতায় জড়িয়ে নিচ্ছিলেন যে, আর এত লম্বা সময় ধরে জড়িয়ে রাখছিলেন যে, স্বপ্ন থেকে জেগে ওঠার পরও মমতার সেই পরশ এমনভাবে অনুভূত হয় যে, এই মাত্রই বুঝি তিনি আলিঙ্গনমুক্ত করলেন, কিন্তু তাতে এক দু:খজনক বিষয়ের প্রতিও দৃষ্টি গেল, জয়নব নামের মধ্যে কষ্টের এক বিষয় পাওয়া যায়। তবে সেই সময়ে এই ধারণা হয় নাই যে, এটা বিদায়ী আলিঙ্গন। আমার অন্তর্দৃষ্টি এদিকে নিবদ্ধ হল যে, সম্ভবত: জামা'তের ওপর কোন পরীক্ষা বা বিপদাবলী আসতে যাচ্ছে, দু:খের কোন সংবাদ হয়ে থাকবে। চিন্তার উদ্রেক হলেও কিছু সময় পর আশ্বস্ত হলাম যে, আল্লাহ্ তা'লা নিজ অনুগ্রহে জামা'তকে সুরক্ষা দান করবেন। (খুতবাতে তাহের, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩১৬)

খলীফাতুল মসীহ রাবে উপরোক্ত রুই'য়ায় হযরত বু জয়নব বেগম সাহেবাকে (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ খামেসের দাদীজান) দেখার তাৎপর্য এটা যে, এই নামের মধ্যে দু:খের বিষয়টি হলো, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবের মৃত্যুর সংবাদ এতে নিহিত ছিল। আর কথা-বার্তা ছাড়া সাক্ষাতের এই বিষয়টির মাঝে যে নিজে সাক্ষাতের জন্য নয় বরং সাক্ষাত করিয়ে দিতে তিনি এসেছিলেন। এর মাঝে এটাই নিহিত ছিল যে, তিনি তার সন্তানের মাধ্যমে খিলাফতের পরমপরাকে জুড়ে দিতে এসেছেন আর অপেক্ষাকৃত সুশ্রী ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী দেখার মাঝে এই বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, এই খিলাফতকালে আহমদীয়াতের বিস্তার আরো উজ্জ্বল ও বর্ধিত আকারে সংঘটিত হবে।

এছাড়ও হযরত নওয়াব আমাতুল হাফিজ বেগম সাহেবার প্রাপ্ত ইলহামটিতে তার নামের মাঝে সুরক্ষার বিষয়ও এই সমর্থন করছে, ইলহামটি হলো- 'ইন্নি মাআ'কা ইয়া মাসরূর'।

বিস্তৃত আকারে লঙ্গরখানা ছড়িয়ে পরার সম্পর্কীত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা

বহু কল্যাণ মণ্ডিত এই পঞ্চম খিলাফতকালে লঙ্গরখানারও ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে। কাদিয়ানে, রাবওয়ায়, লন্ডনে আরো বিশ্বের বহু দেশে। বিস্তৃতির এই উল্লেখ হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর রুইয়ায় রয়েছে। এই রুইয়া তিনি দেখেন ১৯৫৪ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে। তিনি বলেন,

“আমি দেখি কাদিয়ানে এক নতুন লঙ্গরখানা নির্মিত হয়েছে। আকারে অনেক বড় আর জাকজমকপূর্ণ। আমি তা পরিদর্শনে গিয়েছি। জিনিষ-পত্র জমা রাখার কামরা অর্থাৎ স্টোর রুমটি এত বড় যে, সমুদ্র বন্দরের বৃহদাকার গুদাম ঘরটিও এর তুলনায় নেহায়েত ছোট ও তুচ্ছ দেখাবে। স্টোর রুমটি লম্বায় দুই থেকে আড়াইশ' গজ আর চওড়ায় হবে দেড়শ' গজ। আশ-পাশের সব দ্রব্য সামগ্রী নষ্ট হওয়া থেকে বাঁচানোর জন্য ছাদ থেকে শিকল বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা শিকায় চটের বস্তায় পণ্য দ্রব্য জমা করা হয়েছে। মনে হচ্ছিল লক্ষ লক্ষ লোকের খাবার সামগ্রী এখানে রাখা হয়েছে। এছাড়াও নযরে পড়ল অনেক দূর পর্যন্ত রান্না করার চুলা আর রুটি বানানোর তন্দুরী বানানো হয়েছে। এত বিস্তৃত জায়গা জুড়ে এগুলি বানানো হয়েছে যে, সার্বিক ব্যবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল এই লঙ্গরখানার ব্যবস্থাটি যেন বড় এক শহরের সমান। আর এইসব দেখে সেই সময় আমি নিজেই যেন নিজেকে বলছিলাম বর্তমান প্রয়োজন অনুসারে এই লঙ্গরখানা তো আমি বানালাম তবে প্রয়োজন বৃদ্ধি পেলে আমি তা আরও বর্ধিত করব। আর কিছু সময় পরেই আমার মনে হল জায়গায় কোথায় যে আমি লঙ্গরখানা আরো বাড়াব কিন্তু পরক্ষণেই আমার আবার মনে পড়লো যে, আরও জায়গা রয়েছে, এই লঙ্গরখানা সেই দিকেও বাড়ানো যেতে পারে। (আল ফযল ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৫৪, পৃ: ৩, রুইয়া ও কুসুফ, সৈয়দনা মাহমুদ, পৃ: ৫২৪)।

এমটিএ-এর প্রচার কার্যক্রম সম্প্রসারিত

সৈয়্যদনা হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর এক রুই'য়াতে এমটিএ-এর মাধ্যমে টেলিফোন কল-যোগে আপত্তি সমূহের উত্তর দোয়ার উল্লেখও দেখতে পাওয়া যায়। তিনি (রা.) বলেন, এই রুইয়ার শুরুতে আমি দেখি, সরকারী কোন কর্মকর্তা এমন কোন এক বক্তৃতা দিচ্ছে যাতে আহমদীয়াতের ওপর বেশ কিছু আপত্তি করা হচ্ছে, এটা শুনে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) পাবলিক ফোনের এক সেন্টারে চলে গেলেন আর ফোনে সেই কর্মকর্তার উত্থাপিত আপত্তিগুলি প্রত্যাখ্যানের সাথে খণ্ডন করতে শুরু করলেন। কিন্তু তাঁর (আ.) খণ্ডনকারী বক্তব্য যেন ফোনে শুনা যাওয়ার পরিবর্তে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ছিল আর সমস্ত আপত্তিরই খণ্ডন করে ফোনেই তিনি (আ.) জবাব দিচ্ছিলেন আর তাঁর সেই জবাব ঐ সরকারী কর্মকর্তার কাছে পৌঁছিয়েও দেয়া হয়। (আল ফযল, ৫ অক্টোবর ১৯৫৪, পৃ: ৩)

বর্তমানে এমটিএ-এর মাধ্যমে যাবতীয় আপত্তির খণ্ডন করে সাক্ষাত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সরাসরি তা রোদ করা হচ্ছে। খিলাফতে খামেসারকালে এই বিষয়টি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে যে, এমটিএ-এর এই কার্যক্রমও পূর্বেই ভবিষ্যদ্বাণী আকারে বিদ্যমান ছিল। উল্লেখ্য ২৩ জুন

২০০৩ থেকে এশিয়া সেট ৩-এর মাধ্যমে এমটিএ-এর সম্প্রচার কার্যক্রম যাত্রা শুরু করে আর বিশ্বের শেষ প্রান্ত ‘তাবিনী’-তেও এমটিএ-এর সিগনাল পৌঁছাতে শুরু করে। তারপর ২২ এপ্রিল ২০০৪ এমটিএ-এর ২য় চ্যানেল তার সম্প্রচার কার্যক্রম চালু করে আর ২৩ মার্চ ২০০৬ এমটিএ সম্প্রচার কার্যক্রমের অটোমেটেড ব্রডকাষ্ট সিস্টেম-এর উদ্বোধন করা হয়। ১০ জুলাই ২০০৬ এমটিএ-এর সম্প্রচার কার্যক্রমের ইন্টারনেট সিস্টেম সংযোযিত হয়। ২৩ মে ২০০৭ এমটিএ-এর ৩য় চ্যানেল এমটিএ আরাবিয়া-এর উদ্বোধন হয়। এই চ্যানেল আরব বিশ্বের এক উত্তাল আন্দলনের সূচনা করে। ইসলাম আহমদীয়াতের প্রতিরক্ষায় যে উঁচু মানের প্রচার সেবা কার্যক্রম সম্প্রসারিত করা হয়েছে তা দেখে পবিত্র আত্মারা গভীরভাবে আকর্ষিত হচ্ছেন। এমটিএ-এর এই নতুন সম্প্রচার কার্যক্রম স্যাটেলাইটের মাধ্যমে যা পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছিয়ে দেয়া হচ্ছে তা ইসলাম আহমদীয়াতের পতাকাকে বিশ্বের সর্বত্র সমুন্নত রাখছে। (আল ফযল ২৮ মে, ২০০৮, পৃ: ১১)

যুগ খলীফার হাতে আন্তর্জাতিক বয়আত

ইসলাম আহমদীয়াতের এই ৫ম খিলাফতকালে জামা’তের উন্নতির প্রথম ভিত্তি খলীফা নির্বাচনের কয়েক মুহুর্তের মধ্যেই স্থাপিত হয়। আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যমে বিশ্বের সকল আহমদীরা সমবেতভাবে বয়আত গ্রহণ করে ধর্ম জগতে ও খিলাফতের ইতিহাসে এক নব যুগের সূচনা ঘটায় আর সেই থেকে খিলাফতে খামেসার ছায়া তলে আহমদীয়াতের পতাকা প্রতিটি সকাল ও সন্ধায় বিস্তার লাভের দৃশ্যে উদ্ভাসিত হচ্ছে। এই প্রাসঙ্গিকতায় হযরত আবু সাইদ খুদরী বর্ণনায় একটি হাদীস রয়েছে, প্রতিশ্রুত মাহদীর খিলাফত প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ অবস্থায় অধিষ্ঠিত হবে আর এর জন্য খেজুরের বিচি পরিমাণ রক্তপাতও ঘটবে না। (নাসেখুত তাওয়ারিখ, আল্লামা মুজাসসি, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৮৬, ইরানে মুদ্রিত)

সব প্রশংসা আল্লাহ্ তা’লার বিগত দুইশ বছর যাবৎ রক্তক্ষয়ী বিভিন্ন আন্দোলনের মাধ্যমে খিলাফত প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে তুবও তা সফলতার মুখ দেখেনি। এর বিপরীতে ইমাম আখেরুজ্জামান হযরত মসীহ্ মাওউদ প্রতিষ্ঠিত আহমদীয়া খিলাফত শত বর্ষের অধিককাল ধরে শান্তি, মৈত্রী ও সমৃদ্ধির আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার একান্তই নির্ভরস্থল খলীফাতুল মসীহ্গণের আশীষপূর্ণ ছায়ায় সুরক্ষিত ও নিরাপদ রয়েছে। পূর্ণ স্বস্তিতে দুই শতাধিক দেশের আহমদীরা ঐশী খিলাফতের জীবন্ত সাক্ষি হয়ে দিনাতিপাত করছে।

পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে আহমদীয়াতের বিস্তার

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে আল্লাহ্ তা’লা সুসংবাদ দিয়েছিলেন যে, ‘ম্যা তেরী পায়গামকো জমিনকে কিনারো তাক পৌঁচাউঙ্গা’ অর্থাৎ আমি তোমার বাণীকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাব। এই ইলহাম বিভিন্ন রঙ্গে পূর্ণ হয়েছে আর আজোও হয়ে চলছে। ৫ম খিলাফতকালে এ এক নতুন উজ্জ্বলতায় দৃশ্যমান হচ্ছে। ১৬ ডিসেম্বর ২০০৫ কাদিয়ানের বায়তুল আকসা থেকে নিদর্শন আকারে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেসের জুমুআর খুতবা মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আগমণের শুভবার্তা পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছতে থাকে আর এই আশিষপূর্ণ বাণীর জলসার খুতবা ছাড়াও আরো পাঁচটি জুমুআর খুতবা এবং একটি ঈদুল আযহার খুতবাও কাদিয়ান থেকে সরাসরি সম্প্রচারিত হয়। এর তিন মাস পর ২৮ এপ্রিল ২০০৬ পৃথিবীর প্রান্ত সীমা বলে পরিচিত দ্বীপ দেশ ফিজি থেকে হুযূর প্রদত্ত জুমুআর খুতবা বিশ্ব ব্যাপী ছড়িয়ে দেয়া হয়। এমনকি ফিজি সরকার তাদের ন্যাশনাল টিভিতেও হুযূর প্রদত্ত খুতবা লাইভ সম্প্রচার করে। হুযূর ২ মে ২০০৬ ফিজি দ্বীপ পুঞ্জের চোট্ট শহর তাভিনী, যে শহরের ওপর দিয়ে সময় সীমা রেখা অর্থাৎ ডেট লাইন অতিক্রম করেছে ঠিক সেই স্থানে খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস আহমদীয়াতের পতাকা উত্তোলন করেন। অর্থাৎ ঐ পতাকার পূবে এবং পশ্চিমে একই সময়ে অবস্থানকারী ব্যক্তিরা দু’টি ভিন্ন তারিখ গননা করে থাকে। এভাবে আক্ষরিক অর্থেই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বাণীকে পৃথিবীর প্রান্ত সীমানায় পৌঁছে দেয়া সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা সংঘটিত করা হয়। এমনিভাবে আহমদীয়াতের বর্তমানের এই কালটি আহমদীয়াতের বসন্তকাল হিসেবে আখ্যায়ীত হতে পারে। এই খিলাফতকালে ৩০টি নতুন দেশে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আহমদীয়া জামা’ত প্রতিষ্ঠিত হয়ে বর্তমানে ২০৮টি দেশে আহমদীয়াত সম্প্রসারিত হয়েছে।

খিলাফতে খামেসা : হযরত মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.)-এর ইলহাম ও কাশফ এরই পূর্ণতা

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বিভিন্ন ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে রুই’য়া (সত্য স্বপ্ন) কাশ্‌ফ (দিব্য-দর্শন) ও ইলহাম’ এর ধারাবাহিকতা, এর কোন কোনটিতে তাঁর পুত্র হযরত মির্যা শরীফ আহমদ (রা.)-এর ধর্মীয় সেবা প্রদান ও উচ্চ মর্যাদা লাভের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে তবে এই মর্যাদা তিনি (রা.) লাভ করবেন তার পুত্রদের মধ্য থেকে পবিত্র সত্ত্বাধিকারী কল্যাণমণ্ডিত এক সুযোগ্য পুত্রের মাধ্যমে যাকে ইলহামে ‘মাসরূর’ নামে সম্বোধিত করা হয়েছে।

তিনি (আ.) বলেন, “আমি দিব্য-দর্শনে সেই পুত্রকে সম্বোধন করে বলছি, আব্ তু হামারি জাগাহ ব্যাঁয়ঠ আওর হাম চালতে হ্যাঁয়।” (তাযকেরা, পৃ: ৪০৬) অর্থাৎ- তুমি এখন আমার জায়গায় বসে যাও আর আমি চলি।

১৯০৭ ঈসাব্দের ২৮ মে, ইলহাম- **“আ’মারাহুল্লাহু আ’লা খিলাফিত্ তওয়াকু’ইা” উসকো খোদা তা’লা উম্মিদ সে বাঢ়কার উ’মর দেগা** অর্থাৎ খোদা তা’লা তাকে ধারণাতীত দীর্ঘ আয়ুস্কাল দান করবেন। (তাযকেরা, পৃ: ৬০৯)।

“আমরাহুল্লাহু আ’লা খিলাফিত্ তাওয়াক্কু’ই” উসকো ইয়ানী শরীফ কো খোদা তা’লা উম্মিদসে বাঢ়কার আমীর কারেগা অর্থ: তাকে অর্থাৎ শরীফ (আহমদ) কে খোদা তা’লা আশাতীত মর্যাদার অধিকারী নেতা বানাবেন। (তাযকেরা, পৃ: ৬০৯)

১৯০৭ ঈসাব্দের জানুয়ারিতে এক স্বপ্নে শরীফ আহমদকে পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় দেখলাম আর তার পাশে দেখলাম দুই ব্যক্তি দণ্ডায়মান। এদের মধ্যে একজন শরীফ আহমদের প্রতি ইঙ্গিত করে বলছে “সেই বাদশাহ্ এসেছেন”। অপর জন বলল, এখন তিনি কাযী (বিচারক) হবেন, কাযী প্রজ্ঞার অধিকারী আদেশ দাতাকেও বলা হয়। কাযী

তাকেও বলা হয় যিনি সত্যের সমর্থন করেন আর মিথ্যাকে রদ করেন। (তাযকেরা, পৃ: ৫৮৪)

১৯০৭ ঈসাব্দের ডিসেম্বরের আরেকটি ইলহাম হল **“ইন্নি মাআ’কা ইয়া মাসরূর”**। হে মাসরূর! আমি তোমার সাথে আছি। (তাযকেরা, পৃ: ৬৩০)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) পরলোকগমনের মাত্র এক বছর পূর্বে ইলহাম যোগে প্রাপ্ত যে ভবিষ্যদ্বাণীগুলো প্রকাশ করেছেন, তা থেকে এটি স্পষ্ট হয় যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের পঞ্চম খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)-এর পবিত্র ব্যক্তিস্বত্ত্বায় সেই ভবিষ্যদ্বাণীগুলো যথার্থভাবেই পূর্ণতা লাভ করেছে।

প্রথমত: হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্র-পৌত্র হওয়ার কারণে আক্ষরিক অর্থেও তিনি তাঁর (আ.) উত্তরাধিকারী বটে।

তদপরী নেতা ও আদেশ দাতার মর্যাদা এবং প্রজ্ঞার অধিকারী মিমাংসা দানকারীর মর্যাদা তার ব্যক্তিসত্ত্বায় উজ্জলরূপে দৃশ্যমান। জাগতিক কোন মূকুট তার শিরে নাই বটে তবে তিনি এমন এক বাদশাহ্ নির্ভয়ে ও নির্ভীক চিত্তে বিশ্বনেত্রীবৃন্দকে যিনি ন্যায় ও সত্যের প্রতি আনুষ্ঠানিকভাবে আহ্বান জানিয়ে থাকেন। এছাড়াও তিনি তাদেরকে পত্র প্রদান করেন। এই সব পত্র-প্রাপ্তি থেকে বিশ্বের শক্তিধর রাষ্ট্র নায়করা যেমন বাদ যায়নি তেমনি বাদ পড়েনি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নেতারাও। রয়েছেন হিজ হোলিনেস পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট (৩১ অক্টোবর ২০১১), হিজ এক্সিলেন্সী মিস্টার বেনজামিন নেতানিয়াহু, ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী (২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১২), হিজ এক্সিলেন্সী ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের রাষ্ট্রপতি মাহমুদ আহমেদিনেজাদ (৭মার্চ ২০১২), রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি (৮ মার্চ ২০১২), মি. স্টিফেন হারপার, ক্যানাডার প্রধানমন্ত্রী (৮ মার্চ ২০১২), হারামাইন শরীফাইন (দুই পবিত্র স্থান)-এর তত্ত্বাবধায়ক সৌদি আরব রাজতন্ত্রের বাদশাহ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আযীয আল সাউদ (২৮ মার্চ ২০১২), হিজ এক্সিলেন্সী গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের স্টেট কাউন্সিলের প্রিমিয়াম মিস্টার ওয়েন জিয়াবাও (৯ এপ্রিল ২০১২), গ্রেট ব্রিটেন ও উত্তর আয়ারল্যান্ড যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী রাইট অনারেবল ডেভিড ক্যামেরন (১৫ এপ্রিল ২০১২), হার এক্সিলেন্সী জার্মানির চ্যান্সেলর এ্যান্‌জেলা মার্কেল (১৫ এপ্রিল ২০১২), ফরাসী প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি হিজ এক্সিলেন্সী ফ্রাসোঁয়া অলান্দে (১৬ মে ২০১২), হার ম্যাজেস্টি রানী ২য় এলিজাবেথ যুক্তরাজ্য ও কমনওয়েল্‌থ অঞ্চলের রানী (২৯ এপ্রিল ২০১২), ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সর্বময় নেতা আয়াতুল্লাহ সৈয়দ আলী হোসেনী খামেনী (১৪ মে ২০১২) প্রমূখগণ। এইসব নেতৃবৃন্দকে সরাসরি সম্বোধন করে তিনি ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার পথ দেখিয়েছেন। সেই সাথে পারস্পরিক দ্বন্দ ও সংঘাত যা তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ ঘটানোর মত পরিস্থিতি সৃষ্টি করে তা থেকে রক্ষা পাওয়ার পথও তিনি দেখিয়ে যাচ্ছেন।

ব্যক্তি পর্যায়ে রাষ্ট্র নায়কদের পত্র দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হন নি বরং মানবতা সুরক্ষায় পরম মমতায় তিনি বিভিন্ন দেশের পার্লামেন্ট ভবনে সাংসদদের উপস্থিতিতে আর সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দের সমাবেশে এমনকি সামরিক বাহিনী সদস্যদের উদ্দেশ্যে সেনানিবাসে গিয়েও সত্য, ন্যায় ও শান্তির সপক্ষে বিশ্বকে পথ দেখিয়েছেন। অর্থাৎ শাব্দিক অর্থেই তিনি এক মহান বাদশাহ্, ন্যায় বিচারক আর প্রজ্ঞার অধিকারী কার্যকর মিমাংসা প্রদানকারী এ যুগের সিংহপুরুষ, যার মোকাবেলা করার সাধ্য, না আছে শক্তিধর কোন রাষ্ট্রনায়কের কিংবা অন্য কোন ধর্মীয় নেতার।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে এটা যেমন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতার এক প্রামাণিক দলীল তেমনিভাবে তাঁর (আ.) পঞ্চম স্থলাভিষিক্ত হিসেবে আহমদীয়া খিলাফতের নিরবচ্ছিন্ন ঐশী ধারার এক বাস্তব নিদর্শনও বটে। আশা করি, সত্যানুসন্ধানী শান্তিকামী মানুষেরা এথেকে সঠিক পথের দিশা পাবেন।

জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত জ্ঞাতব্য তথ্য

গত ৩১শে মার্চ, ২০১৬ তারিখের পাক্ষিক ‘আহমদী’ পত্রিকায় জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের প্রদত্ত একটি প্রতিবেদনে ‘জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ’ প্রতিষ্ঠার সন হিসেবে ২০০৬ সালকে উল্লেখ করা হয়েছে। এর তথ্যগত সংশোধনী পাঠকদের জ্ঞাতার্থে এ সংখ্যায় তুলে ধরা হলো।

জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা হয়েছে ২০০২ সালের ১লা জানুয়ারীতে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) এর নির্দেশে “মুবাশ্বের কোর্স” চালু করার মাধ্যমে জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হয়েছিল। তখন এই কোর্সে ১৪ জন ছাত্র নিয়ে একটি মাত্র ক্লাস চালু হয়েছিল। প্রথম প্রিন্সিপাল ছিলেন মওলানা সালেহ আহমদ সাহেব, মুরুব্বী সিলসিলাহ্। পরবর্তীতে ২০০৬ সালে পূর্ণাঙ্গ ০৭ বছরব্যাপী “শাহেদ” কোর্স শুরু হয় যার প্রিন্সিপাল হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন মওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দীকী সাহেব, মুরুব্বী সিলসিলাহ্। তখন থেকে প্রতি বছর ছাত্র নেয়া শুরু হয় আর আল্লাহ্ তা’লার অশেষ ফযলে ইতিমধ্যে মুবাশ্বের মুরব্বী কোর্সেও একটি ব্যাচ এবং শাহেদ কোর্সের তিনটি ব্যাচ সাফল্যের সাথে সমাপ্ত করে কর্মক্ষেত্রে মুরুব্বী হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে, আলহামদুলিল্লাহ্।

[তথ্যসূত্র: তাহ্‌রীকে জাদীদ, রাবওয়া কর্তৃক প্রকাশিত খেলাফত জুবিলী স্মরণিকা-২০০৮, পৃষ্ঠা:৩১০ এবং মুবাশ্বের কোর্স চলাকালীন ওকীলুত্ তালীম কর্তৃক প্রেরিত বিভিন্ন চিঠি-পত্রাবলী যা বর্তমানে জেনারেল সেক্রেটারী এবং ন্যাশনাল আমীর সাহেবের দপ্তরে সংরক্ষিত রয়েছে।]

প্রকাশক
মাহবুব হোসেন
পাক্ষিক আহমদী

কলমের জিহাদ

আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের সারমর্ম হলো-
'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ'
- ইমাম মাহদী (আ.)

“ধর্মে কোন জোর-জবরদস্তি নাই”
- আল কুরআন

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিত সংখ্যার পর ৫০)

প্রতিশ্রুত মসীহ্ এবং তাঁর অনুসারীদের ওপর বিরুদ্ধবাদীদের অত্যাচার (Persecution By the Opponents)

আগমনকারী প্রতিশ্রুত মসীহ এবং তাঁর অনুসারীদেরকে বিরুদ্ধবাদী মোল্লা–মৌলবী এবং তাদের দ্বারা প্রভাবিত কিছু সাধারণ লোক এবং কোন কোন রাষ্ট্র–নায়কেরা রাজনৈতিক স্বার্থোদ্ধারের জন্য প্রবল বিরোধিতা করবে-–এই মর্মে বাইবেলসহ অন্যান্য ধর্ম–গ্রন্থে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। সেই সঙ্গে ভবিষ্যদ্বাণীতে এ কথাও বলা হয়েছে যে, অত্যাচার–অবিচারের কন্টকাকীর্ন পথ–পরিক্রমার প্রতিটি ক্ষেত্রে সেই প্রতিশ্রুত মহাপুরুষেরই বিজয় হবে এবং পরিশেষে ক্রমান্বয়ে সেই বিজয়–বার্তা বিশ্বব্যাপী বিস্তৃতি লাভ করবে। বাইবেল থেকে এই বিষয়ে কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণী নিচে উদ্ধৃতিসহ পর্যালোচনা করা হলো।

(ক) সেই প্রতিশ্রুত যুগের আগমনকারীকে চরম বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হবে

* “সেই সময়ে লোকেরা ক্লেশ দিবার জন্য তোমাদিগকে সমর্পণ করিবে, ও তোমাদিগকে বধ করিবে, আর আমার নাম প্রযুক্ত সমুদয় জাতি তোমাদিগকে দ্বেষ করিবে। অনেক ভক্ত ভাববাদী উঠিয়া অনেককে ভুলাইবে। আর অধর্মের বৃদ্ধি হওয়াতে অধিকাংশ লোকের প্রেম শীতল হইয়া যাইবে। কিন্তু যে কেহ শেষ পর্যন্ত স্থির থাকিবে, সেই পরিত্রাণ পাইবে।” (মথি ২৪ঃ৯–১৩)।

উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে আগমনকারী প্রতিশ্রুত মসীহ এবং তাঁর অনুসারীদেরকে ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে যে ধরনের অত্যাচারের সম্মুখীন হতে হবে এবং কষ্ট–ক্লেশ স্বীকার করতে হবে তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। বলা বাহুল্য আহমদীয়া সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা এবং তাঁর অনুসারীদেরকে আমানবিক অন্যায়–অত্যাচারের যাঁতাকলে নিষ্পোষিত করার প্রক্রিয়া কোন কোন দেশের ক্ষেত্রে নৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিনত হয়েছে। যদিও বিগত শতাধিক বছর যাবত এই নিপীড়ণ–নির্যাতন প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে–বরং সাম্প্রতিক কালে (বিংশ এবং এক–বিংশ শতকে) ক্রমাগতভাবে বর্ধিত আকারে পরিদৃষ্ট হচ্ছে–তথাপি ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মিথ্যা দাবীকারীর উদ্ভব হবে এবং অধর্ম বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সত্য দাবীকারকের মান্যকারী এবং ধৈর্যধারণকারীগণ পরিত্রাণ ও বিজয় লাভ করবে। নিম্নোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মসীহের মহা–পরাক্রম এবং মহিমান্বিত প্রতাপ–প্রতিপত্তিসহ আবির্ভাবের সুসংবাদ রয়েছে।

* “আর সর্বজাতির কাছে সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত রাজ্যের এই সুসমাচার সমুদয় জগতে প্রচার করা যাইবে; আর তখন শেষ উপস্থিত হইবে।” “কেননা তৎকালে এরূপ মহাক্লেশ উপস্থিত হইবে, যেরূপ জগতের আরম্ভ অবধি এ পর্যন্ত কখনও হয় নাই, কখনও হইবেও না।” (মথি ২৪ঃ১৪ ও ২৪ঃ২১)

প্রতিশ্রুত মসীহ–এর আধ্যাত্মিক শক্তি ও পরাক্রম এবং মহা–প্রতাপসহ আগমনের ঐশী প্রতিশ্রুতি আহমদীয়া সম্প্রদায়ের অনুসারীদের ক্রমবর্ধমান হারে দেশে দেশে সম্প্রসারনের মাধ্যমে পূর্ণ হয়েই চলেছে (২০১৫ সন পর্যন্ত পৃথিবীর ২০৭টি দেশে)। তাদের শান্তিপূর্ণভাবে পরিচালিত প্রচার–তৎপরতা এবং সাংগঠনিক কর্মকান্ড–সম্বলিত কলমের জিহাদ অব্যাহত রয়েছে এবং ঐশী সাহায্যের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে সত্যান্বেষীগণের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। ঐশী প্রতিশ্রুত পন্থায় ইসলামের নব–জাগরনের এবং প্রচার–সাফল্যের কারণে বিরুদ্ধবাদীরা অন্তর্জালা এবং ঈর্ষা–পরায়নতার সাথে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে চলেছে।

(খ) প্রচণ্ড বিরোধিতা বনাম সত্যের সাফল্য–গাথা

বিরুদ্ধবাদী বিপক্ষ দলের হত্যাকান্ড এবং ঘৃণার তুফান সত্ত্বেও প্রতিশ্রুত মসীহ এবং তাঁর অনুবর্তীগণের শান্তিপূর্ণ ও যুক্তি–সমৃদ্ধ প্রচার তৎপরতা–মূলক কলমের জিহাদ সাফল্যর পথে এগিয়ে চলেছে। এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী লক্ষ্যনীয় ঃ

* “কেননা আমি তোমাদিগকে এমন মুখ ও বিজ্ঞতা দিব যে, তোমাদের বিপক্ষেরা কেহ প্রতিরোধ করিতে এবং উত্তর দিতে পারিবে না। আর তোমরা পিতামাতা, ভ্রাতৃগণ, জ্ঞাতি ও বন্ধুগণ কর্ত্তকও সমর্পিত হইবে, এবং তোমাদের কাহাকেও কাহাকেও তাহারা বধ করাইবে। আর আমার নাম প্রযুক্ত তোমরা সকলের ঘৃণিত হইবে। কিন্তু তোমাদের মস্তকের একগাছি কেশও নষ্ট হইবে না। তোমরা নিজ নিজ ধৈর্যে, আপন আপন প্রাণ লাভ করিবে।”(লুক ২১ঃ১৫-১৯)

* “আর তখন মনুষ্য–পুত্রের চিহ্ন আকাশে দেখা যাইবে, আর তখন পৃথিবীর সমুদয় গোষ্ঠী বিলাপ করিবে, এবং মনুষ্যপুত্রকে

আকাশীয় মেঘরথে পরাক্রম ও মহা প্রতাপে আসিতে দেখিবে।" "আর তিনি মহা তুরীধ্বনী সহকারে আপন দূতগনকে প্রেরণ করিবেন; তাঁহারা আকাশের এক সীমা অবধি অন্য সীমা পর্যন্ত চারিবায়ু হইতে তাহার মনোনীত দিগকে একত্র করিবেন।" (মথি ২৪ঃ৩০-৩১)।

উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলোতে (মথি ও লুক) প্রতিশ্রুত মসীহকে যারা গ্রহণ করবে তাদের প্রতি বিরুদ্ধবাদীদের চরম ঘৃণা, অত্যাচার এবং হত্যাকান্ড-মূলক লোমহর্ষক ঘটনাবলীর চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এমনকি আপন-জন এবং জাতিসমুহ তাদের বিরোধিতার ক্ষেত্রে কার্পণ্য করবে না। পক্ষান্তরে প্রতিশ্রুত মসীহ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তাঁর ক্ষুরধার যুক্তি-জ্ঞান এবং ঐশী সাহায্য-মূলক মহা-প্রতাপ এবং পরাক্রমের সামনে বিরুদ্ধবাদীদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে-যেভাবে বলা হয়েছে যে, "তোমাদের এক-গাছি কেশও নষ্ট হইবে না।"

উল্লেখ্য যে, আকাশীয় মেঘরথে আগমনের দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রতিশ্রুত সেই মহাপুরুষের শান্তিপূর্ণ প্রচার-বাণী সমকালীন পন্ডিত নাম-ধারীগণ এবং তাদের অনুসারীদের কুসংস্কার এবং বিকৃত ধ্যান-ধারণা বিপরীতে অবস্থান গ্রহণ করবে এবং প্রকৃত সত্যের প্রতি জাতি-সমূহের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

(গ) বীজ-বপণের দৃষ্টান্ত দ্বারা সত্যের বিজয়-বার্তা

যখন প্রতিশ্রুত মসীহ আগমণ করবেন তখন কেচ্ছা-কাহিনীর মতো ঘটনা সংঘটিত হবে না। বিশ্ববাসী তাঁকে তৎক্ষনাৎ পুষ্পমাল্য দ্বারা বরন করে নিবে না। তিনি বিশাল তরবারি বা কোন অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারা অথবা নিঃশ্বাস এবং ফুৎকার দ্বারা অবিশ্বাসীদের ধ্বংস করবেন না-যেভাবে অনেক পন্ডিত-নামধারীগণ প্রচার করে থাকেন কোন কোন ভবিষ্যদ্বাণীর অন্তর্নিহিত নিগূঢ় তত্ত্ব ভালভাবে না বুঝার কারণে। প্রকৃত পক্ষে সত্যের পূনর্জাগরণ এবং বিজয় হবে শান্তিপূর্ণ প্রচার-ব্যবস্থার মাধ্যমে এবং ঐশী নির্দেশিত পথ ও পন্থার মাধ্যমে । এই বিষয়ে বাইবেলের নিম্নোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীটির মর্ম্মকথা প্রনিধানযোগ্যঃ

* "তখন তিনি দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাদিগকে অনেক কথা কহিতে লাগিলেন। তিনি কহিলেন, দেখ, বীজবাপক বীজ বপন করিতে গেল। বপনের সময় কতক বীজ পথের পার্শ্বে পড়িল, তাহাতে পক্ষীরা আসিয়া তাহা খাইয়া ফেলিল। আর কতক বীজ পাষাণময় ভূমিতে পড়িল, যেখানে অধিক মৃত্তিকা ছিল না, তাহাতে অধিক মৃত্তিকা না পাওয়াতে তাহা শীঘ্র অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল, কিন্তু সূর্য উঠিলে পর পুড়িয়া গেল, এবং তাহার মূল না থাকাতে শুকাইয়া গেল। আর কতক বীজ কাঁটাবনে পড়িল, তাহাতে কাঁটাগাছ বাড়িয়া তাহা চাপিয়া রাখিল। আর কতক বীজ উত্তম ভূমিতে পড়িল ও ফল দিতে লাগিল; কতক শত গুণ, কতক ষাট গুণ, ও কতক ত্রিশ গুণ। যাহার কাণ থাকে, সে শুনুক। এই জন্য আমি তাহাদিগকে দৃষ্টান্ত দ্বারা কথা বলিতেছি, কারণ তাহারা দেখিয়াও দেখে না, শুনিয়াও শুনে না, এবং বুঝেও না।"(মথি ১৩ ঃ ৩-৯,১৩)

[এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের অনেকগুলো ভবিষ্যদ্বাণীর কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি (পবিত্র কুরআন ৭:৮,২৪:৫৬,৪৮:২৯-৩০,৬১:১০,৬২:৩-৫ আয়াত এবং সংশ্লিষ্ট হাদীসের বরাত দ্রষ্টব্য]

মিথ্যা আশা-আকাংখা পুরন না হওয়ার কারনে অত্যাচারীরা বিপদের পর বিপদের সম্মুখীন হবে এবং বিরূদূবাদীগন মর্ম্মে মর্ম্মে ব্যাথা অনুভব করবে এবং তারা পদ পদে বিকলতার অন্তর্জালার কালাতিপাত করতে থাকবে। পক্ষান্তরে প্রতিশ্রুত মসীহ্ কতৃক প্রতিষ্ঠিত আধ্যাত্মিক আন্দোলন দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারনে ঐশী সাহায্যে শতগুনে বৃদ্ধি পেতেই থাকবে।

(ঘ) দানিয়েল ও অন্যান্য পুস্তকে মনুষ্য-পুত্রের মাধ্যমে সত্যের মহা-বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী

শেষ-কালে প্রতিশ্রুত মসীহের মাধ্যমে মহা-বিজয় সম্বন্ধে নিম্নোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীটি লক্ষ্যনীয় যা পুর্ণতার পথে এগিয়ে চলেছে ক্রম-বর্ধমান আহমদীয়া আন্দোলনের মাধ্যমে।

* দানিয়েল ৭ ঃ ১৩-১৪ "আমি রাত্রিকালীন দর্শনে দৃষ্টিপাত করিলাম, আর দেখ, আকাশের মেঘ সহকারে মনুষ্য-পুত্রের ন্যায় এক পুরুষ আসিলেন, তিনি সেই অনেক দিনের বৃদ্ধের নিকটে উপস্থিত হইলেন, তাঁহার সম্মুকে আনীত হইলেন। আর তাঁহাকে কর্ত্তৃত্ব, মহিমা ও রাজত্ব দত্ত হইল; লোকবৃন্দ, জাতি ও ভাববাদীকে তাঁহার সেবা করিতে হইবে; তাঁহার কর্ত্তৃত্ব, তাহা লোপ পাইবে না, এবং তাঁহার রাজ্য বিনষ্ট হইবে না।"

প্রকৃত আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ স্বচ্ছ-হৃদয়-বিশিষ্ট কিছু-সংখ্যক লোক ব্যতিত অধিকাংশ বস্তবাদী এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ সেই মহাপুরুষের আবির্ভাবের প্রথম দিকে তাঁকে সনাক্ত করতে পারবে না। এই বিষয়ে নিম্নোক্ত রূপকাবৃত্ত অর্থপূর্ণ ভবিষ্যদ্বানী-টি প্রনিধানযোগ্য ঃ

* থিষলনীকীয় ৫ ঃ ১-২ "কিন্তু, হে ভ্রাতৃগণ, বিশেষ বিশেষ কালের ও সময়ের বিষয়ে তোমাদিগকে কিছু লেখা অনাবশ্যক। কারণ তোমরা বিলক্ষণ জান, রাত্রিকালে যেমন চোর , তেমনি প্রভুর দিন আসিতেছে।" [বরাতোক্ত পুস্তকটি নতুন নিয়মের অন্তর্ভূক্ত]

আধ্যাত্মিকভাবে দৃষ্টিহীন ব্যক্তিরা সেই প্রতিশ্রুত বিজয়-দিবসগুলোকে উপলব্ধি করতে পারছে না। ফলত: বিজয়-দিবসগুলি লোক-চক্ষুর অন্তরালে সংগোপনে অগ্রসর হচ্ছে মহা-সুপ্রভাতের তথা সত্যের মহা-বিজয়ের লক্ষ্যে। "তাঁর আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব এমন অনন্তকালীন কর্ত্তৃত্ব যা লোপ পাবে না।" পরিনামে মিথ্যা দূরীভূতে হবে এবং সত্যের দ্বারাই সত্যের বিজয় হবে।(পবিত্র কুরআন ১৭:৮২, ৬১:১০ দ্রষ্টব্য)।

(চলবে)

বিজ্ঞপ্তি

"পাক্ষিক আহমদী" পত্রিকার গ্রাহক চাঁদা যাদের বকেয়া রয়েছে তাদেরকে অতিসত্ত্বর পরিশোধ করার আহ্বান করা হচ্ছে। এছাড়া গ্রাহক সংক্রান্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন-

ফারুক আহমদ বুলবুল

মোবাইল : ০১৯১২ ৭২৪৭৬৯

এক নেতা এক জামা’ত এরই নাম আহমদীয়া খিলাফত

মাহমুদ আহমদ সুমন

মহান খোদা তা’লার এক ঐশী ব্যবস্থাপনা হলো খিলাফত। আল্লাহ্ তা’লা সকল নবীর পরেই খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। খিলাফত ছাড়া ঐশী নবীর কাজ পরিপূর্ণতা লাভ করে না। তাই নবী-রাসূলরা যে মহান দায়ীত্ব নিয়ে এই পৃথিবীতে আগমন করেন, তাঁদের এই মহান দায়ীত্ব ও উদ্দেশ্যকে চূড়ান্ত বিজয়ে পৌঁছান আল্লাহ্ মনোনীত নবীর খলীফাগণ। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের দিকে যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাই যে অগনিত স্থানে মহান খোদা তা’লা এই খেলাফতের কথা উল্লেখ করেছেন। খিলাফত সম্পর্কে এত স্পষ্টভাবে বলা এটাও প্রমাণ করে যে ইসলামে খিলাফত একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।

আল্লাহ্ তা’লা মানবজাতির পথ প্রদর্শনের জন্য নবী এবং রসূল আবির্ভূত করেন। তাঁরা আল্লাহ্-প্রদত্ত শরীয়ত ও শিক্ষার ওপর পূর্ণরূপে আমল করে মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত ও আদর্শ হয়ে থাকেন। মানুষ যেহেতু শরীয়তকে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করার জন্য আদর্শের মুখাপেক্ষী তাই তারা নবী রসূলগণের নমুনাকে লক্ষ্য করেই ইবাদত বন্দেগী ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে উন্নতি করে এবং স্রষ্টার সঙ্গে প্রগাঢ় সম্পর্ক স্থাপন করে। জাতির বয়স যেহেতু কখনও শত শত আবার কখনও হাজার হাজার বছর ব্যাপী দীর্ঘ হয়, আর নবী রসূলগণের আয়ুস্কাল-এর তুলনায় অনেক কম হয়, তাই আল্লাহ্ তা’লা নবী-রসূলদের আদর্শ ও নমুনার প্রবাহকে জারী রাখার জন্য তাঁদের মৃত্যুর পরে এমন অনেক স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করেন যাদের মাধ্যমে নবী-রসূলদের আদর্শ ও তাঁদের আবির্ভাবের উদ্দেশ্য পূর্ণ হতে থাকে। আল্লাহ্ তা’লার কাজকে যারা সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যান এবং যাদের ওপর আল্লাহ্পাক এ কাজের দায়িত্ব অর্পন করেন ইসলামী পরিভাষায় তাঁদেরকে ‘খলীফা’ বলা হয়।

যখন থেকে আল্লাহ্ তা’লা দুনিয়াতে নবুওয়ত-এর নিয়ম প্রচলিত করেছেন তখন থেকে তার সঙ্গে খিলাফতের ধারাও প্রবর্তন করেছেন। প্রকৃতপক্ষে নবুওয়ত ও খিলাফত একে অপরের সঙ্গে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত এবং একই দেহের অবিচ্ছেদ্য অবয়বরূপে সংযুক্ত। খিলাফত ছাড়া কখনো নবুওয়ত প্রবর্তিত হয় নি এবং নবুওয়ত ছাড়া কখনও কোন খিলাফতও প্রতিষ্ঠিত হয় নি। এ জন্যই মহানবী হযরত মুহাম্মদ সল্লালাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন- “মা কানাত নবুওয়তুন কাত্তু ইল্লা তাবিয়াত হা খিলাফাতুন” অর্থাৎ প্রত্যেক নবুওয়তের পর অবশ্যই খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে (কানযুল উম্মাল, জামেউস সাগীর)।

মহান খোদা তা’লা পৃথিবীতে যে খিলাফত কায়েম করবেন। এই প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনের কিছু আয়াত উপস্থাপন করলেই বিষয়টা আরো স্পষ্ট হয়ে যাবে, বলে আমি মনে করি।

যেমন আল্লাহ্ তা’লা পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারার আয়াত নং ৩১ বলেন- “এবং (স্মরণ কর) যখন তোমার প্রভূ ফিরিস্তাদের কে বললেন, নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করতে চলেছি, তারা বললো, তুমি কি এতে এমন কাউকেও নিযুক্ত করবে যে এতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত করবে? অথচ আমরাই তোমার প্রশংসাসহ গুণকীর্তণ করছি এবং তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। তিনি বললেন, নিশ্চয় আমি যা জানি তোমরা তা জান না”।

মহান খোদা তা’লা সূরা আ’রাফ-এর ৭০ নং

আয়াতে বলেন- "তোমরা কি এই কথায় বিস্ময় বোধ করছো যে, তোমাদের প্রভুর পক্ষ হতে তোমাদের নিকট তোমাদেরই মধ্য হতে এক ব্যক্তির মাধ্যমে এক উপদেশবাণী এসেছে, যেন সে তোমাদেরকে সতর্ক করে? এবং স্মরণ করে (সেই সময়কে) যখন তিনি নূহের জাতির পর তোমাদেরকে স্থলাভিষিক্ত (খলীফা) করেছেন এবং তোমাদেরকে দৈহিক শক্তিতে সমৃদ্ধ করেছেন। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র নেয়ামত সমূহকে স্মরণ কর। যেন তোমরা সফলকাম হও।"

একই সুরার ৭৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে- "এবং (সেই সময়কে) স্মরণ কর যখন তিনি আ'দ জাতির পর তোমাদেরকে স্থলাভিষিক্ত (খলীফা) করলেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করলেন যে, তোমরা এর সমতল ভূমিতে প্রাসাদসমূহ নির্মাণ করতে এবং পাহাড়সমূহকে খনন করে বাসগৃহ নির্মাণ করতে। সুতরাং তোমরা স্মরণ কর আল্লাহ্ নেয়ামত সমূহ আর বিশৃঙ্খলাকারী হয়ে পৃথিবীতে বিভেদ সৃষ্টি করিও না"।

একই সূরার ১৩০ নং আয়াতে খিলাফত সম্পর্কে বলা হয়েছে-

"তারা বলল, আমাদের কাছে তোমার আগমনের পূর্বেও আমাদেরকে নির্যাতন করা হত এবং আমাদের কাছে তোমার আগমনের পরেও (নির্যাতন করা হচ্ছে)। সে বলল, অচিরেই তোমাদের প্রভু তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করে দিবেন, এবং তিনি তোমাদেরকে এই ভূ-পৃষ্ঠে স্থলাভিষিক্ত (খলীফা) করে দিবেন, অতঃপর তিনি দেখবেন যে, তোমরা কেমন কাজ কর"।

মহান খোদা তা'লা সূরা ইউনুস এর ১৫ নং আয়াতে উল্লেখ করেন- "অতঃপর তাদের পর আমরা তোমাদেরকে (তাদের) স্থলাভিষিক্ত (খলীফা) করে দিয়েছি যেন আমরা দেখি, তোমরা কেমন আচরণ কর।"

মহান খোদা তা'লা সূরা আল্ ফাতের ৪০ নং আয়াতে খিলাফতের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন- "তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে স্থলাভিষিক্ত (খলীফা) করেছেন, অতএব যে কুফরী করবে তার কুফরীর শাস্তি তারই উপর বর্তাবে। বস্তুতঃ কাফেরদেরকে তাদের কুফরী তাদের প্রতিপালকের দৃষ্টিতে কেবল অসন্তোষই বাড়াচ্ছে, এবং কাফেরদের কুফরী শুধু তাদের ক্ষতিকেই বৃদ্ধি করছে।"

পৃথিবীতে খিলাফত যে কায়েম থাকবে এই ব্যাপারে সবচেয়ে বড় যে দলিল পবিত্র কুরআন শরীফে মহান খোদা তা'লা উল্লেখ করেছেন তা হলো সূরা আন্ নূরের ৫৬ নং আয়াত। এখানে মহান খোদা তা'লা বলেন-

"তোমাদের মাঝে যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে আল্লাহ্ তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি অবশ্যই পৃথিবীতে তাদের খলীফা বানাবেন। যেভাবে তিনি তাদের পূর্ববর্তীদের খলীফা বানিয়েছিলেন। আর অবশ্যই তিনি তাদের জন্য তাদের ধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দেবেন যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির অবস্থার পর অবশ্য অবশ্যই তিনি তা নিরাপত্তায় বদলে দেবেন। তারা আমার ইবাদত করবে। আমার সাথে কাউকে শরীক সাব্যস্ত করবে না। আর এরপরও যারা অকৃতজ্ঞতা করবে, এরাই হবে দুষ্কৃতকারী"।

উপরোক্ত সবগুলো আয়াতেই ইসলামে খিলাফতের ব্যবস্থাপনা যে রয়েছে তার উলেখ পাওয়া যায়। আর এই সব পবিত্র কুরআনের আয়াত দ্বারাই প্রমাণিত হয় ইসলামী খেলাফতের মর্যাদা কতটুকু এবং কোন পর্যায়ে তার প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

উক্ত আয়াতগুলোতে এই প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়েছে যে, মুসলমানদের আধ্যাত্মিক এবং পার্থিব নেতৃত্ব দান করা হবে। কিন্তু খিলাফত সম্পর্কে এত স্পষ্ট বাণী থাকা সত্ত্বেও সারা পৃথিবীতে আজ নেই কোন ইসলামী খলীফা। আজ একমাত্র আহমদীয়া মুসলিম জামা'তেই বিদ্যমান রয়েছে খেলাফতের ঐশী ব্যবস্থাপনা।

খিলাফত সম্পর্কে হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন।

"হযরত হুযায়ফা (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, তোমাদের মাঝে নবুওয়ত ততক্ষণ পর্যন্ত থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ চাইবেন, অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা তা উঠিয়ে নিবেন। তারপর নবুওয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তা ততক্ষণ পর্যন্ত থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'লা চাইবেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা তা উঠিয়ে নিবেন। তখন যুলুম, অত্যাচার, উৎপীড়নের রাজত্ব কায়েম হবে। তা ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকবে যতক্ষণ আল্লাহ্ চাইবেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা তা উঠিয়ে নিবেন। তখন তা অহংকার ও জবরদস্তিমূলক সাম্রাজ্যে পরিণত হবে এবং তা ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ চাইবেন। তখন নবুওয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। অতঃপর তিনি (সা.) নীরব হয়ে গেলেন" (মুসনাদ আহমদ, মিশকাত)।

পবিত্র কুরআন এবং হাদীস থেকে এই বিষয়টি পরিষ্কার যে, আল্লাহ্ তা'লা ঈমান আনয়নকারী ও পূণ্যকর্মকারীদের মাঝে খিলাফত প্রতিষ্ঠা করবেন। অর্থাৎ উম্মতে মুহম্মদীয়া যখন কুরআনের শিক্ষার ওপর সঠিকভাবে আমল করবে তখন আল্লাহ্ এ অঙ্গীকার পূর্ণ করবেন।

এ হাদীসের আলোকে উম্মতে মুহাম্মদীয়ার চৌদ্দ শতাব্দির ইতিহাস আমাদের সামনে সুস্পষ্ট উমাইয়া শাসনামলে যখন সমস্ত ইসলামী মূল্যবোধ এবং বিধানকে পদদলিত করে বাদশাহাত কায়েম হয় তখন তারা ভাল করে জানত যে, খলীফা উপাধি ধারণ না করলে কুরআন ও হাদীসের আলোকে তা মুসলমানদের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা পাবে না। তাই বনু উমাইয়া ও বনু আব্বাসিয়ার রাষ্ট্র প্রধানগণ নিজেদেরকে রাষ্ট্রপতি বা বাদশাহ্ হিসাবে আখ্যায়িত না করে "আমীরুল মু'মিনীন" বা "খলীফাতুল মুসলেমীন" বলেই অভিহিত করত।

মুসলমানদের অধঃপতনের সময়েও এক পর্যায়ে সিন্ধুদেশ হতে স্পেন পর্যন্ত বিশাল মুসলিম রাষ্ট্রটি যখন বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়লো তখনও বাগদাদের আমীরকে সকল রাষ্ট্রপতিই খলীফাতুল মুসলিমীন বলে সম্বোধন করত। কোন রাষ্ট্রপতি সিংহাসনে আরোহণ করলে বাগদাদস্থ খলীফাতুল মুসলিমীন হতে সনদ গ্রহণ করতে হতো আর তাঁর নামে তাকে মুকুট পরানো হত। তাঁর নামে সকল দেশে জুমুআ ও ঈদের খুৎবা ইত্যাদি পড়া হত। তাতারদের দ্বারা যখন বাগদাদ আক্রান্ত ও বিধ্বস্ত হয় এবং শেষ আব্বাসীয় খলীফা মু'তাসিমবিল্লাহকে শহীদ করা হয়, তখন তুরস্কে উসমানী খিলাফত কায়েম করা হয়। ১৯২৪ইং সালে মুস্তাফা কামাল পাশা মুসলমানদের শেষ খলীফা আব্দুল হামীদকে খিলাফতচ্যুত করে চিরতরে তথাকথিত ইসলামী খিলাফতকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। পরে মুসলমানগণ বিভিন্ন দেশে বিভিন্নভাবে খিলাফত প্রতিষ্ঠা করার জন্য আন্দোলন চালায়। কিন্তু তারা শত চেষ্টা প্রচেষ্টা আর আন্দোলন করেও খিলাফতের শৃঙ্খলকে পুনরায় কায়েম করতে পারে নি। কারণ,

আল্লাহ্ তা'লার অভিপ্রায় অন্য কিছু ছিল এবং তা ছিল নবী করীম (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী "খিলাফাতুন আলা মিনহাজিন্ নবুওয়ত" অর্থাৎ নবুওয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠা করা আর আজ আল্লাহ্ তা'লার ফজলে তা প্রতিষ্ঠিতও হয়েছে। প্রতিশ্রুত মসীহ্ এবং মাহ্দী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর মৃত্যুর পর ২৭শে মে, ১৯০৮ইং সনে হযরত মৌলভী হেকীম নুর উদ্দীন (রা.)-এর মাধ্যমে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে ঐশী খিলাফত ব্যবস্থা কায়েম হয়। বর্তমান এই খিলাফতের ৫ম খলীফা সমগ্র বিশ্বে শান্তির অমীয় বাণী প্রচার করে চলেছেন।

ইসলাম এমন শান্তিপ্রিয় ধর্ম যার শিক্ষানুসারে চললে শুধু নিজের কল্যাণ সাধন হবে তা নয় বরং এর ফলে সমগ্র বিশ্বই হতে পারে শান্তিময়। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর যুগে এবং তাঁর ইন্তেকালের পর খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে সাহাবাদের আদর্শ এবং উত্তম গুণাবলীর কারণেই তৎকালীন আরব বিশ্বে এবং আশ-পাশের অঞ্চলসমূহে স্বর্গ রাজ্য গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। আজ মুসলমানগণ এই গুণাবলীর অবমূল্যায়ণের কারণে ইসলামের ওপর কালিমা লেপনের কারণ হচ্ছে। অন্যদিকে আল্লাহ্ তা'লা যুগ-ইমাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর মাধ্যমে এই গুণাবলীর অধিকারী একটি জামাতের প্রতিষ্ঠা করে ইসলামের শিক্ষার আলোকে ঐশী পরিকল্পিত বিশ্ব-শান্তির নব-ব্যাবস্থা গড়ে তুলেছেন। আজ মুসলমানসহ সকল ধর্ম, বর্ণ ও জাতির লোকদের এই শান্তির ছায়াতলে আশ্রয় নেয়া ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন শান্তির রাস্তা খোলা নেই। যেভাবে প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী (আ.) তাঁর কবিতায় লিখেছেন-

"আও লোগো কে এহী নূরে খোদা পাওগে
লো তুমহে তওরে তাসাল্লীকো বাতায়া
হামনে"

অর্থাৎ হে লোকেরা এসো এখানেই খোদার
নূর পাবে
দেখ আমিই তোমাদেরকে স্বস্তি ও সন্তুষ্টির
পথ দেখাচ্ছি।

তাই আসুন, বিরোধিতাপূর্ণ মনোভাব ত্যাগ করে এক নেতার অধীনে থেকে খোদার জ্যোতি লাভের চেষ্টা করি আর নিজেকে আগুন থেকে রক্ষা করি। সেই সাথে আমরা যারা খিলাফতের কল্যাণের ছায়ায় আশ্রয় নেয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছি আমাদেরও উচিত, নিজেদের আমল-আখলাকে পবিত্র পরিবর্তন আনা, প্রকৃত আহমদী হওয়া, বয়আতের অঙ্গিকারগুলোর বাস্তবায়ন করা, যুগ-খলীফার প্রতিটি আদেশ-নিষেধের ওপর আমল করা, সন্তানদেরকে উত্তম তরবিয়ত দিয়ে ইসলামী শিক্ষায় গড়ে তোলা। তবেই না আমরা নিজেকে একজন সত্যিকার আহমদী বলে পরিচয় দিতে পারি এবং খলীফার দোয়ার বরকত লাভের আকাঙ্খা করতে পারি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে যুগ খলীফার নির্দেশমত চলার এবং বিশ্ব শান্তির লক্ষ্যে কাজ করে যাওয়ার তৌফীক দিন, আমীন!

masumon83@yahoo.com

মানুষের ভাল-মন্দ আল্লাহ্ নির্ধারণ করেন

মোহাম্মদ সালাউদ্দীন ঢালী

পার্থিব জগতে প্রত্যেকটি মানুষ সুখ-শান্তি ও মঙ্গল কামনা করে থাকেন। মঙ্গল করা মানুষের নৈতিক দায়িত্ব। ভাল কাজ করা এবং সফলতা অর্জন করা সৌভাগ্যের বিষয়। কবি ভরত চন্দ্র বলেছিলেন–

"আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে"

তিনিও মানুষের জন্য মঙ্গল কামনা করে এমন উক্তি করেছিলেন। মহান আল্লাহ্ ভাল কাজের জন্য স্বর্গ বা বেহেশ্ত তৈরী করে রেখেছেন। ভাল কাজ করে ভাল ফল পাবে আর মন্দ কাজ করে শাস্তি পাবে। আল্লাহ্ বলেছেন– **"সদাচারের প্রতিদান সদাচার ছাড়া আর কি হতে পারে"** (সূরা রহমান)। আল্লাহ্ সুসংবাদ দিয়েছেন পার্থিব জগতে যদি তাঁর বান্দা ভাল কাজ করেন তবে তার স্থান হবে বেহেশ্ত। বেহেশ্তবাসী হতে হলে কি করনীয় তা আমাদের জানা প্রয়োজন। সাধারণভাবে মনে হয়, আমরা প্রায় সকলে জানি কোন কাজের কারণে বেহেশ্ত আর কোন কাজের ফলে নরক ভোগ করতে হয়। জানার তো শেষ নেই। জানার জন্য প্রয়োজন প্রচুর পড়ালেখা। "The more you read, the more you learn" –মনিষীদের এমন উক্তি আমাদের জ্ঞান দান করে, কিন্তু তারপরও আমরা মূর্খতার পরিচয় দেই। মানুষ সৃষ্টির মালিক আল্লাহ্। মানুষকে সৃষ্টি করে তিনি জ্ঞান, বিবেক, বুদ্ধি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন– **"মাটির শুকনো ঢিলের মত পঁচা কাদা থেকে তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।"** ছোট শিশু যখন মায়ের কোল ভরে আসে তখন তার নিষ্পাপ অপরূপ মাধুর্য ছড়ায়। আল্লাহ্ তাকে ধীরে ধীরে বড় করেন, তার মধ্যে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেন, রসূলের অন্তর্ভুক্ত করান। তিনি বলেন– **"তুমি নিঃসন্দেহে রসূলের অন্তর্ভুক্ত। সরল সহজ পথ অবলম্বনকারী।"** (সূরা ইয়াসিন)

সৃষ্টির সেরা জীব হয়ে রসূলদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া স্বাভাবিক। ব্যক্তি জগতে মানুষ যেমন সমাজের অন্তর্ভুক্ত, ঠিক তেমনি আধ্যাত্মিক জগতে বা পার্থিব জগতে মানুষ রসূলদের অন্তর্ভুক্ত। এটি তার মানবিক বন্ধন যা সুদৃঢ় করে প্রতিটি অন্তরকে। মানুষ হিসেবে জ্ঞান লাভ করার পর অবশ্যই সহজ

সরল পথ অবলম্বন করা বাধ্যতামূলক। বক্রতা আল্লাহ্ পছন্দ করেন না। বক্রতা মানুষকে হিংস্র করে। খারাপ পথ দেখায়, শয়তান তাকে সাহায্য করে। আর্থিক ধন-সম্পদ মানুষকে হিংস্রতা এবং বক্রতার দিকে ঠেলে দেয়। আল্লাহ্‌র রসূল সব সময় মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে চলতেন। মন থেকে হিংসা দূর করতে হবে। মোহ ত্যাগ করতে হবে। অন্তরে একবার হিংসা ঢুকে গেলে তার ধ্বংস অনিবার্য। ধন-সম্পদ দিয়ে আল্লাহ্ আমাদের পরীক্ষা করেন। এসব সম্পদ তো তিনি আমাদের দিয়েছেন। সমস্ত কিছুর মালিক তিনি। ইচ্ছে করলে সবকিছু তিনি কেড়ে নিতে পারেন। আল্লাহ্ বলেছেন– **“দুই উদয়াচল দুই অস্তাচল সব কিছুর মালিক তিনি। দু’টি সমুদ্রকে পরস্পর তিনি মিলিত করেছেন। উভয় সমুদ্র থেকে মুক্তা ও প্রবাল পাওয়া যায়।”**

বর্তমানে বিজ্ঞানীরা যত গবেষণা, যত অনুসন্ধান করেছেন সব কুরআনের আয়াত পর্যালোচনা করে। গভীর সমুদ্রের মাঝে কি আছে তিনি তা স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন। দিনের পর দিন বছরের পর বছর এই বিষয় নিয়ে বিজ্ঞানীরা গবেষণা, যত করেছেন। মাত্রা অতিরিক্ত করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। পৃথিবী নিজস্ব ভৌগলিক অবস্থানে ঘুরছে। সৌরজগৎ নির্দিষ্ট নিয়মে ঘূর্ণায়মান। পৃথিবী থেকে অন্য কোন গ্রহে যেতে গেলে আল্লাহ্ ধোঁয়া, আগুনের শিখা ছিটিয়ে দিবেন। মানুষ মাত্রা অতিক্রম করুক আল্লাহ্ তা কোনদিন সম্ভব করবেন না তিনি সৃষ্টিকর্তা, তিনিই ধ্বংসকর্তা। যেমন তিনি বলেছেন– **“এই ভূ পৃষ্ঠের প্রতিটি মানুষ ধ্বংস হয়ে যাবে।”** এত কিছুর পরও আমরা তাঁর বিন্দু পরিমাণ গুণগান করি না। কি নিষ্ঠুর এই মানুষ। পার্থিব জগত নিয়ে সদা ব্যস্ত। কে কত ধন সম্পদের মালিক হতে পারব এই প্রতিযোগিতায় মত্ত। অপরাধ করা যেন আমাদের নিত্য দিনের ফ্যাশন। এসব মানুষকে দুনিয়ায় যেমন চেনা যায় আবার পরকালেও চেনা যাবে যেমন আল্লাহ্ বলেছেন– **“সেখানে চেহারা দেখে অপরাধীকে চেনা যাবে।”** এমন এক সময় আসবে যখন বিচারের জন্য আমাদেরকে একত্রিত করা হবে। **“সে দিন সমস্ত মৃতদেরকে জীবিত করবেন” আমি অবশ্যই একদিন মৃতদেরকে জীবিত করব।”** এটা ভাবা উচিত নয় যে আমাদের আর জীবিত করা হবে না। তিনি যেদিন সকলকে দন্ডায়মান করবেন এবং জিজ্ঞাসাবাদের জন্য একত্রিত করবেন। অপরাধী ও পুণ্যবানদের চেহারা দেখা যাবে। ভাল কাজের প্রতিদানস্বরূপ তিনি বেহেশ্‌ত দিবেন। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন– রসূল (সা.) এরশাদ করেছেন– ৭ ব্যক্তি এমন যাদেরকে আল্লাহ্ তাঁর বিশেষ ছাঁয়া দান করবেন– “যেদিন তাঁর ছাঁয়া ব্যতীত আর কোন ছাঁয়া থাকবে না। (১) ন্যায়-নিষ্ঠাবান শাসনকর্তা। (২) এমন যুবক যে আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে করতে যৌবনে পদার্পণ করেছেন। (৩) এমন ব্যক্তি যে মসজিদ থেকে বের হওয়ার পর তার অন্তর মসজিদের সাথেই ঝুলে থাকে যতক্ষণ না সে পুনরায় মসজিদে প্রবেশ না করে। (৪) এমন দু’ ব্যক্তি যারা কেবল আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে পারস্পরিক ভালবাসা রাখে। তাঁরই জন্য তারা একত্রিত হয় এবং তাঁরই জন্য তারা পৃথক হয়। (৫) এমন কোন ব্যক্তি নির্জনে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে অতঃপর তার চক্ষুদ্বয়ে অশ্রু প্রবাহিত হয়। (৬) এমন ব্যক্তি যাকে কোন সম্ভ্রান্ত সুন্দরী রমনী খারাপ কাজের জন্য আহ্বান করে কিন্তু সে বলে আমি তো আল্লাহ্‌কে ভয় করি। (৭) এমন ব্যক্তি যে কোন দান করে এবং সে তা গোপনে করে এমনকি তার ডান হাত কি ব্যয় করে, তা তার বাম হাতও জানে না। (বুখারী ও মুসলিম) যিনি সবকিছুর মালিক, যার হাতে আমাদের মরা বাঁচা, যিনি আমাদের খাদ্য দাতা, সর্বেসর্বা তাঁকে আমরা ভুলে থাকতে পারি না। সকাল-বিকাল-সন্ধ্যা সকল সময় তাঁর দরূদ পাঠ করা প্রতিটি ঈমানদার ব্যক্তির জন্য অবশ্যই কর্তব্য এবং দায়িত্ব।

অন্য এক হাদীসে এসেছে– হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূল (সা.) এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্ তা’লা বলেন– “আদম সন্তান আমাকে কষ্ট দিয়ে থাকে তারা দাহর বা ফযলকে গালি দিয়ে থাকে, অথচ আমিই দাহর অর্থাৎ আমার হাতেই ফযলের পরিবর্তনের ক্ষমতা, দিন রাত্রির পরিবর্তন বা ওলট-পালট আমিই করে থাকি।” (বুখারী ও মুসলিম) মহান আল্লাহ্ এই পৃথিবীর মধ্যে অনেক জাতিকে সৃষ্টি করেছিলেন এবং একমাত্র তাঁর নির্দেশেই আবার তা ধ্বংস হয়ে গেছে। কি অসীম ক্ষমতার অধিকারী তিনি তা কল্পনাতীত। আল্লাহ্ তা’লা আমাদের আগের জাতিদেরকে অনেক ধন-সম্পদ দিয়েছিলেন। কিন্তু তারা সেই ধন সম্পদ নিয়ে নিজেরা গর্ব করত এবং বলত এগুলো আমরা নিজেরা তৈরী করেছি। পবিত্র কুরআনে হযরত মূসা (আ.) এর সম্প্রদায়ের ঘটনা এসেছে এভাবে। আল্লাহ্ বলেছেন– **“নিশ্চয় কারূন মূসার সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অতঃপর সে তাদের বিরুদ্ধাচরণ আরম্ভ করল আমি তাকে এত ধনভান্ডার দান করেছিলাম যার চাবি বহন করতে কয়েকজন শক্তিশালী লোকের পক্ষে কষ্টসাধ্য ছিল।”** অন্য জায়গায় এসেছে– “সে বলল, **“আমি এ ধন-সম্পদ আমার নিজস্ব জ্ঞান গরিমা দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছি।’ আল্লাহ্ তাকে বলেছেন–“সে জানে না যে, আল্লাহ্ তার পূর্বে অনেক সম্প্রদায় ধ্বংস করে দিয়েছেন, যারা শক্তিতে ছিল তার চেয়ে অনেক প্রবল এবং ধন-সম্পদেও অধিক প্রাচুর্যশীল।”**

মানুষ বাঁচে আশায়। কেউ দারিদ্র্যের কষাঘাতে দিন এনে দিন খেয়ে আবার কেউ বড় বড় অট্টালিকার ওপর মহা সুখে বাস করে। আল্লাহ্ ধনী-দরিদ্র সকলকে সমান চোখে দেখেন। তার কাছে কোন পক্ষপাতিত্ব নেই। সকালে সূর্য উঠলে সে সূর্যের আলো একজন গরীব মানুষের ঘরের চালেও পড়ে আবার একজন গৃহস্থের ঘরের ছাদেও পড়ে। আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে তিনি মানুষকে দুঃখ দিতে পারেন। আশা নিরাশার দোলাচলে মানুষ দোদুল্যমান। এক দিকে বেদনার ঘনঘটা অন্য দিকে সুখের বিলাস বহুল সাজ-সজ্জা। মোহিত লাল মজুমদার তাঁর একটি কবিতায় লিখেছেন–

আমারে তোমরা ভুলে যেও ভাই
এসেছিনু ব্যথা ভুলে
পান করিবারে..........বারি
কীর্তিনাশা কূলে
বহু জনমের ব্যর্থ পিপাসা
এবার পুরিবে মনে ছিল আশা
ভাঙা মন্দিরে বেঁধেছিনু বাসা ছিন্ন বটের
মূলে
প্লাবনের মুখে ভেসে গেল সব
কীর্তিনাশার কূলে।

সবই তাঁর ইচ্ছা, আমরা শুধু তাঁর ইবাদত করব তিনিই আমাদের সাহায্য করবেন।

ভালো মানুষ

মওলানা শরীফ আহমদ আফ্রাদ

বাপ ভালো তার বেটা ভালো
মা ভালো তার ঝি,
জল ভালো তার শাপলা ভালো
গাই ভালো তার ঘি ॥

এমন কিছু পিতা-মাতা আছে যারা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন– আহা! আমার ছেলেটাকে যদি মানুষ করে যেতে পারতাম অথবা মেয়েটাকে যদি মানুষ করে যেতে পারতাম। জানা কথা, প্রত্যেক প্রজাতিই তার স্বজাতিকেই জন্ম দিয়ে থাকে। এটি একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া যা জন্ম থেকে জন্মান্তর পর্যন্ত চলে আসছে। আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে ভালো রাখার জন্য প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়া সুপ্তভাবে তার ভেতর রেখে দিয়েছেন। যাতে করে ভালো মন্দ যাচাই করার মত শক্তি সে সঞ্চয় করতে পারে। শুধু কি তাই? মানব জন্মের পূর্বেই আল্লাহ্ তা'লা তার ভেতর পবিত্রকরণ শক্তি প্রবিষ্ট করে দিয়েছেন। তাই মানুষের একটু সদিচ্ছা থাকলেই ভালো হতে পারে। হাদীস শরীফে আছে– হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম (সা.) বলেছেন- "প্রত্যেক মানব সন্তান ইসলামের ওপর জন্মগ্রহণ করে থাকে কিন্তু তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদী নাসারায় পরিণত করে দেয়।" (বুখারী)

পাঠক! হাদীসটি পড়ে ভালোভাবে চিন্তা করুন। ইহুদী জাতি অভিশপ্ত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন অপর দিকে খ্রিষ্টানরা হয়েছে পথভ্রষ্ট। অর্থাৎ পথ পেয়েও হারিয়ে ফেলেছে। আমরা অভিশপ্তও হতে চাই না এবং পথভ্রষ্টও হতে চাই না। আমরা হতে চাই আদর্শ মুসলমান অর্থাৎ পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণকারী। যার প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হবেন। আর এমন ব্যক্তি পরিবার এবং সমাজের কল্যাণ করে থাকে।

প্রতিটি ভূমিই উর্বর যদি তার কৃষক হয় ভালো। আসল কথা হলো- পরিবার প্রধানেরা যদি সঠিক চিন্তা ভাবনা নিয়ে ইসলামের আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে সন্তানদের তরবিয়ত করেন তাহলে সন্তানরা ভালো হবে বলে আশা করা যায়। যেভাবে একজন আদর্শ কৃষক তার জমি থেকে সঠিক পরিচর্যার মাধ্যমে কাঙ্খিত ফসল তুলে নেয়। এভাবে যে কোন অবিভাবকও তার অধিনস্তদের যত্ন নিলে ভালো ফলাফল আসতে পারে।

যতনে রতন মিলে
আলস্যে কাটে ধন,
শ্রমে বাড়ে আয়ু মেধা
সুস্থ থাকে দেহ, মন

সন্তানদেরকে ভালো মানুষ করে গড়ে তুলতে হলে একটি পরিবারের পিতা-মাতাকে সৎ প্রকৃতির হতে হয়। সন্তানদের তরবিয়ত শুরু হয় পরিবার থেকে। স্বামী স্ত্রীর প্রতি, স্ত্রী স্বামীর প্রতি, বাবা-মায়েরা সন্তানের প্রতি, সন্তানেরা বাবা-মায়ের প্রতি, ভাই বোনের প্রতি, বোন ভাই এর প্রতি সদাচারী হলে পারিবারিক সম্পর্ক মজবুত হয়, ভালো থাকে। মোটকথা- সন্তানেরা হলো আল্লাহ্‌র দেওয়া পিতা-মাতার কাছে গচ্ছিত আমানত। তাদের উত্তম তরবিয়তের ধাঁচে গড়ে তোলাই পিতা-মাতার কাজ। তাদের দেখাশোনার জন্য পিতা-মাতাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সন্তানরা যদি বিপথগামী হয় তাহলে পিতা-মাতাকে আল্লাহ্‌র কাছে জবাব দিতে হবে।

হাদীস শরীফে এসেছে– হযরত রসূলে করীম (সা.) বলেছেন– "তোমরা প্রত্যেকেই রাখাল এবং তোমাদের প্রত্যেককে অধীনস্তদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমরা কিভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করেছ" (বুখারী)।

পিতা-মাতারা নিজেদের মধ্যে তাক্বওয়ার মান বৃদ্ধি করবে। কেননা সন্তানরা ভালো তরবিয়তপ্রাপ্ত হলে দুনিয়াবী দিক থেকেও তারা সম্মানিত হবে। আবার ভালো সন্তানদের দোয়ার ফল পিতা-মাতারা লাভ করবেন। এজন্য প্রত্যেক পিতা-মাতাকে তাদের সন্তানদের তরবিয়তের ব্যাপারে বিশেষ যত্ন নিতে হবে। কোথাও না আবার পিতা-মাতার অবহেলার কারণে সন্তানরা নষ্ট হয়ে যায়। একবার নষ্ট হয়ে গেলে তাকে আর ফেরানো সম্ভব হয় না। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন– "হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্বওয়া অবলম্বন কর এবং প্রত্যেককে চিন্তা করে দেখা উচিত যে, আগামী কালের জন্য সে অগ্রে কি প্রেরণ করেছে। এবং তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্বওয়া অবলম্বন কর, তোমরা যে কর্মই কর তা সম্পর্কে নিশ্চয় আল্লাহ্ সবিশেষ খবর রাখেন। (সূরা আল্ হাশর ঃ ১৯)

উপরোক্ত আয়াতের এই অংশ অর্থাৎ "প্রত্যেককে চিন্তা করে দেখা উচিত যে, আগামী কালের জন্য সে অগ্রে কি প্রেরণ করেছে।" এখানে দু'টি কথা বুঝানো হয়েছে। তার প্রথমটি হলো, মৃত্যু পরবর্তী জীবনের জন্য কি নেক আমল করেছ। যার কারণে পরকাল সুখের হতে পারে। আর দ্বিতীয় হলো- আগামীকালের জন্য কি প্রজন্ম রেখে যাচ্ছ। উভয় দিকটিকে আমাদের খেয়াল করতে হবে। আমরা যেন ভালো প্রজন্ম সমাজকে উপহার দিয়ে যেতে পারি। ধন-সম্পদ মানুষকে বড় করে না। যে পরিবারে নৈতিক চেতনা এবং মানবিক মূল্যবোধ আছে তারাই সমাজে এবং আল্লাহ্‌র কাছে সম্মানিত। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআন করীমে বলেন–"নিশ্চয় আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত ঐ ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক মুত্তাকী। (সূরা আল্ হুজুরাত ঃ ১৪)

আরেক জায়গায় আল্লাহ্ তা'লা বলেন– "নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে এরাই সৃষ্টির মধ্যে উৎকৃষ্টতম। (আল্ বাইয়্যেনাহ ঃ ৮)

সুতরাং ভালো মানুষ পেতে হলে পিতা-মাতাকে সৎকর্মশীল ও মুত্তাকী হতে হবে। নতুবা আমাদের দীর্ঘশ্বাস কোন কাজে আসবে না।

ভালো প্রজন্ম তৈরী না হলে এর কুফল দেখুন– যদি কোন পরিবারের মেয়েরা ভালো না হয় তাহলে এই মেয়ে যেই পরিবারে বউ হয়ে যাবে সেই পরিবারে অশান্তি দেখা দিতে পারে। কারণ প্রকৃতি মানুষের মনকে টানে অর্থাৎ সে যে প্রকৃতি ও পরিবেশে বড় হয়েছে তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইবে। তখন স্বামীর সাথে বিরোধ দেখা দিতে পারে। আবার এই মেয়ে যখন অন্য মেয়ের শাশুড়ী হবে তখন বউ শ্বাশুড়ীতে সমস্যা বাঁধতে পারে। এভাবে পরিবার, পরে সমাজে সমস্যা দেখা দিতে

পারে। তাই একটি পরিবারে নারীর ভূমিকা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। প্রচলিত কথা–

রাজার দোষে রাজ্য নষ্ট
প্রজা কষ্ট পায়,
গিন্নীর দোষে সংসার নষ্ট
সুখ চলে যায়।

মেয়েরা তথা নারীরা সরাসরি আগুন না হলেও আগুন বহনকারী উত্তপ্ত লোহা। কেউ যদি সরাসরি আগুনে হাত দিয়ে দ্রুত টেনে নেয় তবে তার হাত পুড়বেনা কিন্তু আগুনের রূপধারনকারী একটি লোহায় হাত দিয়ে দ্রুত টেনে নিলেও হাতে ফোসকা পড়ে যাবে।

একটি পরিবারে আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য নারীর ভূমিকা অনেক বেশী। যে পরিবারের মহিলা আদর্শবান সে পরিবারের ছেলে মেয়ে বলেন আর স্বামীই বলেন তারা আদর্শবান হবে। এজন্যই বলা হয়– 'রাজ্য চালান রাজা আর রাজাকে চালান রানী, কোন মেয়ে যখন আরেক পরিবারে বউ হয়ে যাবে তার উচিত হবে শ্বশুর শ্বাশুড়ীর সাথে ভালো আচরণ করা। কেননা তারাই এখন তার পিতা-মাতা, এ মনোভাব সৃষ্টি করতে হবে। অন্য একটি পরিবার থেকে এখন স্বামীর বাড়ির উত্তরাধিকারী হচ্ছে, সে কিছু পেতে হলে নমনীয় এবং কোমল স্বভাব প্রদর্শন করতে হবে। এর বিপরীত হলে নতুন পরিবারের লোকেরা মেনে নিতে চায় না। তাই নতুন পরিবারে এসে তাদের মন জয় করতে হবে। তাহলেই সেই পরিবারে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

অপরদিকে একটি মেয়ে যখন কোন পরিবারে বউ হয়ে আসে তার প্রতি উত্তম আচরণ এবং ভালোবাসার সাথে ব্যবহার করা উচিত। লক্ষ্য করে দেখলে দেখা যায় অধিকাংশ মেয়েরা বাবার বাড়িতে অত্যন্ত আদরের সাথে বড় হয়। নতুন পরিবেশে বউ হয়ে আসলে তার থেকে পরিপূর্ণ কাজ আদায় করতে চাইলে হবে না। তাকে আগে নতুন পরিবারের নিয়ম-কানুন ও মানুষদের বুঝার সুযোগ করে দিতে হবে। শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর বউকে নিজের মেয়ের চাইতে বেশী ভালোবাসতে হবে। একটি কথার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই আর তা হলো- একটি গাছে যখন নতুন 'কলম' করা হয় তখন পুরানো গাছের তুলনায় নতুন কলম করা গাছের প্রতি কৃষক বেশী যত্ন নিয়ে থাকে। তেমনিভাবে একটি মেয়ে যখন কারো বাসায় বউ হয়ে আসে তখন সেও কলমের বৃক্ষের মত নাজুক হয়ে থাকে। তাই তার সাথে সৌহার্দ্যের আচরণ করাই শ্রেয়। পুরানো গাছের সাথে ভালোভাবে লেগে গেলেই সে ভালো ফল দিতে থাকবে। সেই সময়টুকু তাকে দিতে হবে।

এখন আসা যাক ছেলেদের বিষয়ে। পুরুষদের অনেক দায়িত্ব পালন করতে হয়। এই দায়িত্ব পালনের বিষয়টি তাকে বুঝাতে হবে। তাকে সঠিক তরবিয়ত দিয়ে বড় করতে হবে। ছোট থেকে তরবিয়তের ব্যবস্থা না নিলে বড় হয়ে আর বাবা-মায়ের কথা শুনবে না। তরবিয়ত শূন্য অবস্থার মধ্যে থেকে বড় হলে বাবা-মায়েরাও কাজে আসে না। আবার সমাজেরও কোন কাজে আসে না। আল্লাহ্ তা'লা বলেন– "ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দুনিয়ার সৌন্দর্য। (সূরা কাহ্ফ ঃ ৪৭) সন্তান-সন্ততি যদি চরিত্রবান না হয় তাহলে তা হয় মা-বাবার জন্যে পরীক্ষার কারণ– দুঃখের বোঝা। সন্তান-সন্ততি সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা অন্য জায়গায় বলেন–

"এবং জেনে রাখ যে, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পরীক্ষার কারণ (সূরা আনফাল ঃ ২৯)। আল্লাহ্ তা'লা এখানে বলেন, হে আমার বান্দা! সন্তান-সন্ততির আশা-আকাঙ্খা তোমরা অবশ্যই করে থাকো, কিন্তু তাদেরকে যদি মানুষের মত মানুষ না বানাও এবং আমার বান্দা হিসাবে যদি গড়ে তুলতে না পার, তাহলে এ সন্তান-সন্ততি যারা তোমাদের চোখের পুতলি হবার কথা তারাই তোমাদের চোখের কাঁটায় রূপান্তরিত হবে, তোমাদের বহু দুঃখ-কষ্টের কারণ হবে, তোমাদের জন্য হবে জাহান্নামের ইন্ধন।

হযরত রসূলে করীম (সা.) বলেছেন– 'আকরিমু আওলাদাকুম ওয়া আহসিনু আদাবাহুম'। অর্থাৎ- সন্তান-সন্ততিকে সম্মান দেখাও এবং এভাবে তাদেরকে উত্তম আচরণ ও শিষ্টাচার শিক্ষা দাও (ইবনে মাজাহ) সমাজে অনেক পিতা-মাতা আছেন যাদেরকে সন্তানরা খোঁজ খবর নেয় না। আবার এমন অনেক সন্তান আছে যাদের কারণে পিতা-মাতাকে অন্যের কাছে লজ্জিত হতে হয় অর্থাৎ এমন অন্যায় কাজ করে বসে যা নিন্দিত। এই জন্যই ছোটকাল থেকেই ছেলে মেয়েকে ইসলামী ধাঁচে পরিকল্পিতভাবে তৈরী করতে হবে। অবহেলা করলেই তাদের কারণে আফসোস করতে হবে। মানুষ বানানো হবে না। এক কবি বলেছেন–

একহি রাহ সে নিকালতে হ্যায়
মুত আওর পুত
আগার হরি ভজে
তো পুত পুত হ্যায়
ওয়ারনা মুত কা মুত।
অর্থাৎ, যে পথ দিয়ে নির্গত হয় মূত্র,
সে পথ দিয়েই হয় পুত্র।
আল্লাহ্ ওয়ালা হলে পুত্র হয় পবিত্র,
নতুবা সে-ই হয়ে যায় মূত্র।

কোন এক শোনা গল্প থেকে–এক ছেলে তার বৃদ্ধ পিতাকে পুকুর পাড়ে নিয়ে গেছে ফেলে দেওয়ার জন্য। এটি তাদের পূর্বপুরুষ হতে রীতি চলে আসছে। বাবা বৃদ্ধ হলে পুকুরে ফেলে দেয়া হয়। ছেলে যখন পিতাকে পুকুর পাড়ে নিয়ে যায়। বাবা বুঝতে পেরেছে ছেলে কেন তাকে পুকুর পাড়ে নিয়ে এসেছে। বৃদ্ধ পিতা ছেলেকে বলল– বেটা আমাকে একটু দূরে ফেল। ছেলে বলল, কেন! বাবা বলল– এইখানে তোর দাদাকে ফেলেছিলাম। ছেলে থমকে গেল। ভাবতে লাগল (আজকে আমার বৃদ্ধ পিতাকে পুকুরে ফেলে দিলে আমি বৃদ্ধ হলে আমার ছেলেও আমাকে পুকুরে ফেলে দিবে। আমাদের বংশ কি এভাবেই চলতে থাকবে। ছেলে আর বাবাকে পুকুরে ফেললো না। আসলে কথায় আছে জমির ঢেলা কৃষকের জমিতেই ভেঙ্গে থাকে। আইলে উঠিয়ে ভাঙ্গে না। দুনিয়াতে যে যেভাবে কাজ করবে, আচরণ করবে তার পরিণতি তাকে এই পৃথিবীতেই ভোগ করতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা সমগ্র সৃষ্টি মানুষেরই কল্যাণে সৃষ্টি করেছেন। সমস্ত সৃষ্টিকে মানুষের অধীন করেছেন। যাতে মানুষ সর্বোত্তম কাজটি করে সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ রাখে। সমাজকে সুন্দর করার দায়িত্ব মানুষের। নিজ স্বার্থকে বিসর্জন দিতে হবে। কাউকে অন্যায়ভাবে ডিঙ্গিয়ে বড় হওয়াতে কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। আল্লাহ্ই মানুষের হৃদয় দেখেন এবং তার যথাযথ মর্যাদা দান করেন। আল্লাহ্ বলেন–

"আল্লাহ্ যাকে চান সম্মানিত করেন এবং যাকে চান লাঞ্ছিত করেন। সকল কল্যাণ আল্লাহ্র হাতে (সূরা আলে ইমরান ঃ ২৭)

সুতরাং আমাদের সকলেরই উচিত যাই করি না কেন, নিজ স্বার্থের জন্য নয় বরং আমাদের কাজটি যেন নিজ কল্যাণ সহ অন্যেরও কল্যাণের কারণ হয়।

একটি গল্প শোনাই– "এক টুনটুনি পাখি বেগুন ক্ষেতে এক বেগুন গাছে বাসা বাঁধে। বাসায় ডিম পাড়ে। ডিমে তা দিয়ে বাচ্চা ফোটায়। বাচ্চাদের চোখ ফোঁটেনি। একদিন এক বিড়াল খোঁজ পেয়ে যায়। আসে পাখি ছানা খাওয়ার জন্য। টুনটুনি বিড়ালের

মোকাবেলায় ছানাদের বাচানোর কোন ক্ষমতা রাখে না। সে এক কৌশল আঁটলো। টুনটুনি বাসা থেকে উড়ে এক গাছে বসল। মন থেকে চাইছিলনা কিন্তু বাচ্চাদের স্বার্থে বিড়ালকে বলল– প্রণাম করি মহারানী! বিড়াল বেজায় খুশি হলো! ভাবলো আরে! আমাকে প্রণাম করছে। এটি তো ভাল সুযোগ। বিড়াল টুনটুনির ছানা না খেয়ে চলে গেল। পরদিন আবার বিড়াল আসলো। প্রণাম পাওয়ার আসায়। টুনটুনি আবারো বললো- প্রণাম করি মহারানী! বিড়াল খুশি মনে চলে গেল। এভাবে প্রণাম পাবার আশায় বিড়াল প্রতিদিন আসে আর টুনটুনি বাচ্চাদের বলল- বাচ্চারা উড়তে পারিস। বাচ্চারা বলল, হ্যা মা পারি। টুনটুনি বলল, ঐ তাল গাছে উড়ে যাও। বাচ্চারা উড়ে গেল। বিড়াল লেজ নাড়াতে নাড়াতে আসে প্রণাম নিতে। বেগুন গাছের কাছে আসতেই টুনটুনি বলল- দূর হও লক্ষি ছাড়া বিড়ালনী। বিড়াল লাফ দিয়ে বেগুন গাছে উঠে দেখে বাচ্চা নেই–

লক্ষ্য মোদের টিকে থাকা
ভক্ত কারোর নই,
সাত সমুদ্র পাড়ি দেব
করব কিসে ভয় ॥

সুতরাং একজন মানুষ যদি ধর্মীয় আদর্শ তথা নিয়মিত নামায আদায় করে আল্লাহ্ তা’লার যে আদেশ-নিষেধ রয়েছে তার ওপর আমল করে, কথায় ও কাজে কাউকে কষ্ট না দেয়। মানুষকে ভালো কাজের আদেশ করে এবং মন্দ কাজ হতে নিষেধ করে। জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জন করে। সৎ সঙ্গ লাভ করে। অন্যের শুভাকাঙ্খী হয়। বৃদ্ধ পিতা-মাতার খেয়াল করে। সত্যিকার তাক্ওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে তাহলেই এমন ব্যক্তি একজন মানুষ হতে পারে।

উপরোল্লিখিত বিষয় কারো ভিতর না থাকলেও যদি কোন পিতা-মাতা ছেলে মেয়েকে মানুষ হওয়ার আশা করেন তাহলে কেমন করে হবে। একজন মানুষ প্রতিটি ক্ষেত্রে ভালো চিন্তা-ধারা যেন নিজের মধ্যে ধারণ করে। আল্লাহ্ তা’লা পবিত্র কুরআনে বলেন– এবং আমরা প্রত্যেক মানুষের কর্ম তার স্কন্ধে সংযুক্ত করে দিয়েছি। এবং কেয়ামত দিবসে আমরা তার (কর্ম ফলের) কিতাবকে বাহির করে তার সামনে রেখে দিব, যা সে সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত আকারে পাবে। (বনী ইসরাঈল ঃ ১৪) তাই আমাদের প্রতিটি মানুষের কর্মই যেন ভালো হয়, বিশুদ্ধ হয়। পিতা-মাতাকে যেমন সন্তানদের তরবিয়তে বিশেষ দায়িত্ব পালন করতে হবে। অপরদিকে পিতা-মাতারা বৃদ্ধ হলে সন্তানদেরও উচিত পিতামাতার খেয়াল করা। শেষ বয়সের উপকারের আশায় মানুষ সন্তান নিয়ে থাকে। তাই তাদের হেলা করা কোন সন্তানের পক্ষেই ভালো হবে না।

আল্লাহ্ তা’লা পবিত্র কুরআনে বলেন, “এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো। যদি তাদের একজন বা উভয়ে তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয় তাহলে তাদের উভয়কে তুমি ‘উফ’ পর্যন্ত বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না, বরং তাদেরকে সম্মানসূচক ও মমতাপূর্ণ কথা বলিও। তুমি করুণা ভরে তাদের ওপর বিনয়ের বাহু অবনত রেখো এবং দোয়া করো, ‘হে আমার প্রতিপালক! তুমি তাদের উভয়ের প্রতি (পিতা-মাতার) সেভাবে রহম করো যেভাবে তারা আমাকে শৈশবে প্রতিপালন করেছিল। (বনী ইসরাঈল ঃ ২৪-২৫) ২৫নং আয়াতের “রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বাইয়ানী সাগীরা” এই অংশের একটু ব্যাখ্যা দেওয়া সমীচীন মনে করছি। অর্থ হলো- হে আমার প্রভু! তুমি তাদের উভয়ের প্রতি সেভাবে রহম করো যেভাবে তারা আমাকে শৈশবে প্রতিপালন করেছিলেন। লক্ষনীয় বিষয় হলো, এখানে ‘কামা’ অর্থ ‘যেভাবে’ বলা হয়েছে। যদি পিতা-মাতারা শৈশবে সন্তানদের উত্তম শিক্ষা দিয়ে বড় করে থাকেন তাহলে উত্তমভাবে তাদের প্রতি রহম কর। আর যদি মন্দ বা অবহেলায় কুশিক্ষায় বড় করে থাকেন তাহলে তাদেরকে না সেভাবেই দেখা হয়! তাই সন্তানকে যদি মানুষ বানাতে চান, তবে পিতা-মাতাকে অত্যন্ত সজাগ দৃষ্টি রেখে তাদেরকে গড়ে তুলতে হবে।

মানুষের মাঝে মানুষ খুঁজি
খুঁজি, যদি পাই তারে
আমার মাঝে আছে কি যে,
খুঁজে এনে দেবে অন্যেরে ॥

কবিতা-

গাহি তোমারই গান

জি. এম. সিরাজুল ইসলাম

হে আল্লাহ রহমান !...
তোমার গুণের সীমানা নাই
হে আহাদ ওয়াহেদ খোদা! তোমার তুলনা জগতে নাই।
জানি তুমি, স্রষ্টা তুমি...
হে প্রভু এ গান গাই, তোমার তুলনা নাই, জগতে নাই।

পাক কুরআনে আছে লেখা তোমারই কথা,
সৃষ্টি করো নি কোন কিছুই তুমি অযথা।
যা করো তুমি সবই এ ভূবনে মানবের কল্যাণ,
তোমার দয়া ছাড়া কেহ পাবে না পরিত্রাণ।
ধরা তুমি, দাও তারে...
যে যেমনে তোমায় চাই, তোমার তুলনা নাই, জগতে নাই।

জিজ্ঞাসিছো কুরআনের সূরা আর রহমানে,
কোন্ নেয়ামত অ-স্বীকার করিবে মানবগনে
তোমার দয়া, তোমার মায়া, তোমারই এহ্‌সান,
নিজ গুনে দান করো সবারে অ-পরিমান
স্রষ্টা তুমি, মালিক তুমি...
অন্য কেউ তো নাই, তোমার তুলনা নাই, জগতে নাই।

সব চেয়ে বড় এহ্‌সান তুমি সেদিন দেখাবে,
যে দিন হাবীয়া জাহান্নামও শূন্য পড়ে রবে।
পাপি তাপি নাস্তিকেরা সবে স্বর্গে চলে যাবে,
সাত নরকের জানালা-দুয়ার হাওয়াতে দোল খাবে।
শুধু তুমি, নাই তোমার...
কোন শরীক নাই, তোমার তুলনা নাই, জগতে নাই।

হাজারও রহস্য ঘিরে তোমার এই মহাজগৎ সৃষ্টি,
এক মেরুতে বরফ জমে অন্যতে বৃষ্টি।
আপন অক্ষে সঞ্চালিত গ্রহ-নক্ষত্র,
মানবোপযোগী বানিয়েছো তুমি দিবা-রাত্র।
লা শারিকা লাহ্ , লা শারিকা লাহ্...
তোমার কোথাও বিরোধ নাই, তোমার তুলনা নাই, জগতে নাই।

অযাচিত অসীম দানের ভান্ডার তোমার হাতে প্রভু,
তোমার তুলনা হয়না অন্য কারো সাথে কভু।
তোমারই দান জমিন আসমান ভূমন্ডল আর বায়ূ,
ধার্য করে দিয়েছো তুমি নির্দ্ধারিত আয়ূ।
তুমি ছাড়া, তুমি ছাড়া,
অন্য কেউতো নাই, তোমার তুলনা নাই, জগতে নাই।

কি নেয়ামত তোমার কুদরত গাছের ডালে ডালে,
টক, তেতো, ঝাল, সুমিষ্ট ফল, ফলে নোনা জলে।
নদ-নদী সাগর মহাসাগর জলে ভরা,
আবার পানি বিনে মরু-ভূমিতে হয় ক্ষরা।
এ-কী লীলা, আজব খেলা...
বোঝার উপায় নাই, তোমার তুলনা নাই, জগতে নাই।

সৃষ্টি কুলের শ্রেষ্ঠ এই আশরাফুল মাখলুকাত,
মোদের ধন্য করেছে মুহাম্মদের উম্মত।
সাত শত আদেশ নিষেধের বোঝা দিয়েছ কাঁধে তাঁরে,
জিন্দেগী পার হলো যে তাঁর আল্লাহ্‌রই খাতিরে-
এই বাণী, এই বাণী...
মানতে আমিও চাই, তোমার তুলনা নাই, জগতে নাই।

কুরআন শরীফ পাঠ ও শ্রবণকারীর জন্য কিছু জরুরী নির্দেশ

ভাষান্তর ঃ **মওলানা মোহাম্মদ রুহুল বারী**

কুরআন আমাদের ঐশীগ্রন্থ। এটি পুতঃপবিত্র এতে কোন সন্দেহ নাই। এটি মানবজাতির জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। কুরআন পবিত্র আর পবিত্রতা ছাড়া এর আদেশ-নিষেধ অনুধাবন করা যায় না। তাই কুরআন অনুধাবন করার শর্ত হল আত্মিক পবিত্রতা সেই সাথে বাহ্যিক। শারীরিক পবিত্রতা। পবিত্র এই গ্রন্থ পাঠকারী ও শ্রবণকারীর জন্য কিছু জরুরী নির্দেশনা রয়েছে তা নিম্নে তুলে ধরছি।

* সূরা ফাতেহা পাঠ শেষে এবং এ রকম অন্যান্য দোয়ার আয়াত পাঠ করলে তা শুনলে (আমীন) বলতে হয়। অর্থাৎ "হে আল্লাহ্ তুমি আমাদের দোয়া কবুল কর"। এটা উচ্চ স্বরে বা মনে মনেও পাঠ করা যায়।

নোট ঃ অনেকে এমন আছেন যারা 'রাব্বানা' শব্দ শুনলেই মনে করেন এখানে কোন দোয়া হবে তাই (আমীন) বলেন। কিন্তু অনেক সময় এমন হয় যেখানে (আমীন) বলা প্রয়োজন হয় না।

* কুরআন শরীফ পড়ার সময় বা শোনার সময় যেখানে নবী (সা.) এর মোবারক নাম আসে সেখানে বিনয়ের সাথে (সা.) পাঠ করা জরুরী। কুরআন করীমে ৪ বার রসূলে করীম (সা.) এর নাম এসেছে।

* সূরা বাকারার শেষ আয়াতে 'রাব্বানা'র সাথে যে দোয়া করা হয়েছে তা পাঠ করলে বা শুনলে (আমীন) বলতে হয়। সেই সাথে এই দোয়াও করা উচিত "হে আল্লাহ্ এই দোয়া গ্রহণ কর। হে আমার খোদা! আমার অতীতের পাপ ক্ষমা কর আর ভবিষ্যতের সকল পাপ থেকে রক্ষা কর এবং নিরাপদ রাখ। হে আমার প্রভু! তোমার জন্য সকল প্রশংসা।

* সূরা আলে-ইমরান, ১৯ নং আয়াতে আছে খোদা তা'লা সাক্ষ্য দিচ্ছেন তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নাই আর ফিরিশ্‌তারাও এবং জ্ঞানীরাও ন্যায়ে প্রতিষ্ঠিত থেকে এই সাক্ষ্যই দেয়। এর উত্তরে বলা উচিত আমিও সাক্ষী হে আমার প্রভু প্রতিপালক তুমি ছাড়া কোন উপাস্য নাই।

* সূরা বনী ইসরাঈল, ১১২ নং আয়াতে আছে আর তুমি অতি উত্তমরূপে খোদার গৌরব ঘোষণা কর। এর উত্তরে "আল্লাহু আকবার" বলা উচিত। (আল্লাহ্ সবচেয়ে বড়)

* যেখানে জান্নাতের কথা আসে তখন এই দোয়া করা "হে আল্লাহ্! আমাদেরকে তোমার রহমতে প্রবেশ করাও। "

* যেখানে শাস্তির কথা আসে সেখানে এই দোয়া কর, "হে আল্লাহ্! আমাদের শাস্তি দিও না।"

* সূরা ওয়াকেয়া এর ৭৫ নং আয়াত যখনই পাঠ করা হয় বা শোনা হয় "তুমি তোমার প্রভু প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর" এর উত্তরে বলা জরুরী "আমার প্রভু পবিত্র বড়ই মহান"।

* সূরা আলা, ২নং আয়াতে আছে, "তুমি তোমার মহান ও সর্বোচ্চ প্রভু প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর"। যখন এটি পাঠ করা হয় বা শোনা হয় তখন এই দোয়া পড়তে হয় "পবিত্র আমার মহান ও সর্বোচ্চ প্রভু-প্রতিপালক"।

* সূরা কিয়ামাহ্, ৪১ "তিনি কি মৃত্যুকে জীবিত করতে সক্ষম নন।" এর উত্তরে বলা উচিত "হ্যা নিঃসন্দেহে তিনি যা ইচ্ছা করেন, তা করার ক্ষমতা রাখেন"।

* সূরা মূলক, ৩১ আয়াত "তুমি বল তোমাদের (সব) পানি অনেক গভীরে নেমে গেলে তোমরা বল তো দেখি কে তোমাদের জন্য (স্বচ্ছ) বহমান পানি এনে দিবে"? এর উত্তরে বলতে হয় "আল্লাহ্ই এটাকে আমাদের নিকট নিয়ে আসেন। তিনি বিশ্বজগতের পালনকর্তা।

* সূরা বাকারা-২০০, সূরা নিসা-১০৭, সূরা হুদ-৫৩। আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর নিশ্চয় তিনি অতি ক্ষমাশীল ও বার বার কৃপাকারী"। এর উত্তরে বলতে হয় "আমি খোদা তা'লার ক্ষমা চাই"।

* সূরা গাশিয়া-২৬, ২৭ "নিশ্চয় আমাদের দিকেই তাদের ফিরে আসতে হবে। এরপর তাদের হিসাব নিকাশ নেয়ার দায়িত্ব থাকবে আমাদের ওপর। এটি পাঠকারী বা শ্রবণকারী বলবে "হে আল্লাহ্ আমাদের নিকট হতে সহজ করে হিসাব গ্রহণ কর"।

* সূরা ত্বীন-৯, "আল্লাহ্ কি সব বিচারকের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক নন"। উত্তরে বলতে হয়, হ্যাঁ এবং আমিও এতে সাক্ষ্যদাতাগণের অন্তর্ভুক্ত"।

* সূরা নাসর-৪, "তখন তোমার প্রভু-প্রতিপালক এর প্রশংসা সহ (তাঁর) পবিত্রতা (ও) মহিমা ঘোষণা কর এবং তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় তিনি বার বার তওবা গ্রহণকারী। এর উত্তরে বলতে হয় "হে আল্লাহ্ তুমি পুতঃপবিত্র। সকল প্রশংসা তোমার তুমি আমাকে ক্ষমা কর"।

* সূরা ওয়াকেয়াহ ৬০, ৬৪, ৭০,৭৩-এর উত্তরে বলবে "বরং তুমিই এসব কাজ করেছো হে আমার খোদা"।

* সূরা ইয়াসীন-৭৯, ৮০ যখন হাড়গোড় পঁচে গলে যাবে তখন এগুলোকে কে জীবিত করবে?" এর উত্তরে বল "যিনি এগুলো প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন তিনিই এগুলো জীবিত করবেন। আর তিনি প্রত্যেক সৃষ্টির বিষয়ে সর্বোচ্চ"।

* সূরা ইয়াসীন–৮২, "যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি কি এগুলোর অনুরূপ সৃষ্টি করতে সক্ষম নন"। উত্তরে বলতে হয়, "তিনি সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা আর তিনি সর্বজ্ঞানী"।

* সূরা আস শামস-৯, "কেননা তিনি এ (আত্মার) প্রকৃতিতে (এর জন্য) ভালমন্দ (বিচার করার যোগ্যতা) প্রোথিত করে দিয়েছেন। এর জবাবে বলতে হয়, "হে আল্লাহ্ আমার আত্মাকে তাক্‌ওয়া দান কর কারণ তুমিই হলে সর্বোত্তম পবিত্রতাদানকারী ও এর মালিক"।

* সূরা আল্ আহযাব-৫৭, "নিশ্চয় আল্লাহ্ এ নবীর প্রতি রহমত পাঠান এবং তাঁর ফিরিশতাও (এ নবীর জন্য দোয়া করে)। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরাও তাঁর প্রতি দরূদ এবং বেশী বেশী সালাম পাঠাও"। এই আয়াত পাঠ করলে তা শুনলে দুরূদ শরীফ পাঠ করতে হয়"।

আল্লাহ্ তা'লা যেন আমাদের এর ওপর বেশী বেশী আমল করার তৌফিক দান করেন। বেশী বেশী কুরআন শরীফ পাঠ করার তৌফিক দান করেন। কুরআন শরীফের তত্ত্বজ্ঞান যেন আমরা লাভ করতে পারি। কুরআন শরীফের আদেশ-নিষেধ মেনে চলি এবং তা অনুধাবন করার চেষ্টা করি, (আমীন)।

সংগ্রহ ঃ বার্ষিক আল ফযল-২০০৭, খণ্ড ৫২-৫৭।

নবীনদের পাতা-

মহানবী (সা.)-এর আবির্ভাবের পূর্বে মক্কা ও মদীনাতে ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের আগমনের কারণ

সাকিবুল হাসান (মহসিন)
ছাত্র, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ।

পৃথিবীতে যত ইহুদী রয়েছে তাদের কাছে ইস্রাইল তথা জেরুযালেম হচ্ছে সবচেয়ে প্রিয় ভূমি। এই নগরীকে ইহুদীরা তাদের প্রতিটি ব্যক্তিসত্ত্বার মূর্তপ্রতীকরূপে গণ্য করে থাকে। প্রায় দুই হাজার বছরের দাসত্ব, নির্যাতন, নির্বাসন কাটিয়ে ঈশ্বর নির্ধারিত আবাসভূমি তাঁরই পছন্দের জাতি ইস্রাইলদের নিরন্তর বসবাসের অর্জিত অধিকারের পূর্ণতায় বিশ্বময় সকল ইহুদীর হৃদয়-মন্দিরে জেরুযালেম এক মহাপ্রাপ্তির অবিস্মরণীয় অনুভূতিরূপেই চির জাগরুক।

“জেরুযালেম” শব্দটি কোন্ ভাষার তা জানা যায় না। হিব্রু ভাষায় উচ্চারণ “ইরোআসসালিয়েম” (Yerushalyim) অর্থ শান্তির নগরী। আরবীতে এই নগরীর নাম “বাইতুল মুকাদ্দাস” বা আল কুদ্স। এই নগরীটি পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন নগরী, বহু যুগের বিভিন্ন রাজত্বের রাজধানী এবং ধর্মীয় বিবেচনায় পৃথিবীর প্রধানত তিনটি একেশ্বরবাদী ধর্ম ইহুদী, খ্রিষ্টান এবং ইসলামের কাছে সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ ও পবিত্র।

বিশ্বজুড়ে ইহুদীদের কাছে জেরুযালেম হচ্ছে শত শত বছরের বিলাপান্তে মহিমা মন্ডিত জাতীয় স্বাধীনতার এক শাশ্বত প্রতীক ও জাতির নবজাগরণের কেন্দ্রভূমি।

খ্রিষ্টানদের কাছে এই নগরী তাদের ত্রাণ-কর্তার (ঈসা আ.) মৃত্যুযন্ত্রণা ও সেই যন্ত্রণার বিনিময়ে মানবজাতির মুক্তির বিজয়োল্লাস।

যে সকল ইহুদী জেরুযালেমের বাইরে বসবাস করেন তারা এই মনোবাসনা রাখেন যে, তাদের মৃত্যুর পর যেন তাদের মৃতদেহ পবিত্র নগরী জেরুযালেমে দাফন করা হয়।

আবার খ্রিষ্টানরা মনে করে এই জেরুজালেমেই তাদের তথাকথিত ঈশ্বর পুত্র ঈশ্বর ঈসার (আ.) তাদের সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে গেছেন, তাই খ্রিষ্টানদের কাছেও এই নগরী অতীব পবিত্র।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যেই নগরীতে মৃত্যুবরণ করাও ইহুদী ও খ্রিষ্টানরা নাজাতের কারণ মনে করে সেই পবিত্র ভূমি ছেড়ে তারা কেন মক্কা মদীনাতে হিজরত করে বসতি স্থাপন করেছিলেন?

তাছাড়া দেখুন মক্কা এমন একটি নগরী যেখানে সেই সময় না পর্যাপ্ত খাদ্য ও পানি ছিল, আর না সেখানে সুন্দরভাবে বসবাস করার উপকরণ সমূহ ছিল। তাহলে ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের মক্কা ও মদীনাতে আগমনের কারণটা কি ছিল?

কারণ এটাই ছিল যে, হযরত মূসা (আ.)কে আল্লাহ্ তা’লা জানিয়েছিলেন, প্রতিশ্রুত (প্যারাক্লিত) মহামানব যাকে সৃষ্টি না করলে আল্লাহ্ এই পৃথিবী সৃষ্টি করতেন না, তাঁকে এ অঞ্চলে পাঠাবেন।

আর তওরাতের ভাষায় তা এরকম যে, “আমি তাদের জন্য তাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হতে তোমার সদৃশ এক ভাববাদী উৎপন্ন করব, ও তার মুখে আমার বাক্য দিব। আর আমি তাকে যা যা আজ্ঞা করব, তা তিনি তাদেরকে বলবেন, আর আমার নামে তিনি আমার যে সকল বাক্য বলবেন, তার প্রতি যে কর্ণপাত করবে না, তার কাছে আমি প্রতিশোধ নিব।” (দ্বিতীয় বিবরণ, ১৮ঃ ১৮-১৯)

অতএব মূসা (আ.) তার জাতিকে অর্থাৎ ইহুদীদেরকে বলেছিলেন তোমাদের মধ্যে যে, সেই প্যারাক্লিত মহাপুরুষকে পাবে সে যেন তাকে মেনে নেয়। এখন প্রশ্ন উঠে যে, সেই প্যারাক্লিত মহামানব কোথায় আবির্ভূত হবেন?

এটাও তওরাতে বলা হয়েছে, আর সেটা কিভাবে বলা হয়েছে, বলা হয়েছে যে, সেই মহামানব তাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হতে আসবেন। এখানে বলা হয়নি যে, সেই মহামানব তাদের মধ্য হতেই আসবেন বরং বলা হয়েছে যে, তাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হতে আসবেন। আর তাদের অর্থাৎ বনী ইস্রাইলদের ভ্রাতৃ বলতে বনী ইসমাঈলকে বোঝায়। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, তাদের ভ্রাতৃগণের মধ্যে অর্থ হচ্ছে সেই মহামানব ইহুদীদের মধ্যেই আসবেন। কিন্তু একটু চিন্তা করে দেখুন কোন দেশের প্রতিবেশী কি সেই দেশেরই কোন গ্রাম বা এলাকাকে বোঝানো হয়? হয় না। বরং একটি দেশের প্রতিবেশী আরেকটি দেশই হয়ে থাকে। তেমনি একটি জাতির ভাই আরেকটি জাতি-ই হয়ে থাকে। এরকমই তাদের বলতে বনী ইস্রাইলদের বোঝানো হচ্ছে। আর বনী ইস্রাইল জাতির ভ্রাতৃ বলতে বনী ইসমাঈল জাতিকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ পরিষ্কার হয়ে গেল ‘প্যারাক্লিত’ সেই মহামানব বনী ইস্রাইল জাতির ভাই বনী ইসমাঈল জাতিকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ পরিস্কার হয়ে গেল প্যারাক্লিত সেই মহামানব বনী ইস্রাইল জাতির ভাই বনী ইসমাঈল জাতি থেকে আবির্ভূত হবেন।

এখন আসা যাক বনী ইস্রাইলীয় জাতি কোথায় বসবাস করেন। তওরাতে বলা হয়েছে, আল্লাহ্র আদেশে ইব্রাহীম (আ.) তাঁর ছোট স্ত্রী হযরত হাজেরা এবং পুত্র ইসমাইল (আ.)কে, ‘ফারান’ নামক উপত্যকায় ছেড়ে আসেন। আর ইতিহাস দ্বারা সাব্যস্ত আজকের মক্কা সেই ‘ফারান’ ভূমি। অর্থাৎ মক্কার পূর্ব নাম ‘ফারান’ তাছাড়া মক্কার আদি পুস্তক সমূহে এই ফারানভূমির উল্লেখ পাওয়া যায়। মক্কা ছাড়া আজ অবধি অন্য কোন জায়গার নাম ফারান বের হয়নি এবং কোন অঞ্চলের নাম ফারান রাখাও হয়নি। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মক্কাই তওরাতের উল্লিখিত সেই ফারান। আর এই ফারান অর্থাৎ আজকের মক্কাতেই হযরত হাজেরা এবং ইসমাইল (আ.)কে ছেড়ে আসা হয়েছিল।

আর মূসা (আ.) এর মৃত্যুর পর তাঁর অনুসারীদের মধ্যে যারা ধর্মপ্রাণ ইহুদী ছিলেন, তারা তওরাতের সেই বাণী বুঝতে পেরেছিলেন এবং এটাও বুঝতে পেরেছিলেন যে, সেই মহামানব আমাদের ভ্রাতৃ অর্থাৎ বনী ইসমাইল জাতিতে আসবেন। অর্থাৎ জাজিরাতুল আরবে অর্থাৎ মক্কা ও মদীনাতে বসবাসকারী বনী ইসমাঈল জাতি। এবং জাজিরাতুল আরবই হচ্ছে ফারান ভূমি। তাই ধর্মপ্রাণ ইহুদীরা হযরত মূসা (আ.) এর মৃত্যুর পর ফারান তথা মক্কা মদীনাতে হিজরত করে আসে এবং বসতি স্থাপন করে। মক্কার কাছের শহর খায়বারে বেশি সংখ্যক ইহুদী তখন বসতি স্থাপন করেন এবং মদীনাতেও কিছু ইহুদী বসতি স্থাপন করে। মদীনাতে যথাক্রমে বনু কোরায়যা, বনু নযির ও বনু কায়নুকাআ এই তিনটি ইহুদী গোত্র বসতি স্থাপন করে। অর্থাৎ মক্কা ও মদীনাতে ইহুদীরা হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জন্মের প্রায় ১৭০০ বছর পূর্বে বসতি স্থাপন করে এবং মহানবী (সা.) এর আগমনের প্রতিক্ষায় থাকে।

এটাতো গেল ইহুদীদের হিজরতের কারণ এবং সময়কাল। কিন্তু খ্রিষ্টানরা কখন এবং কেন মক্কায় আসলেন? খ্রিষ্টানদের মক্কায় আসার উদ্দেশ্য এটাই ছিল যেটা ইহুদীদের উদ্দেশ্য ছিল। আমরা জানি হযরত মূসা (আ.) এর মৃত্যুর ১৩ শত বছর পর হযরত ঈসা (আ.) ইহুদীদের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছেন। ঈসা (আ.) এসে কি করলেন? তিনি এসে তওরাতের সঠিক শিক্ষাকে ইহুদীদের মাঝে তুলে ধরলেন। কিন্তু ইহুদীরা ঈসা (আ.) এর বিরোধিতা করতে লাগলেন। তবে কিছু ধর্মপ্রাণ ইহুদী তখন ঈসা (আ.) এর ওপর ঈমান আনে এবং পরবর্তীতে তারাই খ্রিষ্টান নামে পরিচিতি লাভ করে। আর সেই খ্রিষ্টানদেরকে হযরত ঈসা (আ.) বলেছিলেন তওরাতে যেভাবে বলা হয়েছে একজন মহামানব আসবেন যার নাম হবে আহমদ, তিনি আমার পরে আসবেন । এবং তিনি ফারান ভূমিতে আগমন করবেন। তাই ঈসা (আ.) এর মৃত্যুর পর ধর্মপ্রাণ খ্রিষ্টানরা 'আহমদ'কে মানার জন্য অর্থাৎ ফারান অর্থাৎ মক্কাতে হিজরত করেন। এবং মক্কার নাজরানে এসে বসতি স্থাপন করেন। খ্রিষ্টানরা আনুমানিক ইহুদীদের ১৩০০ বছর পর এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জন্মের ৪০০ বছর পূর্বে মক্কাতে বসতি স্থাপন করেন।

কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (সা.) যখন নবী দাবী করেন আর বলেন যে, আমিই সেই আহমদ যার ভবিষ্যদ্বাণী তওরাত ও ইঞ্জিলে লেখা আছে। তখন মক্কা ও মদীনার ইহুদী ও খ্রিষ্টানরা বিরোধিতা করতে লাগল। এবং ইহুদীরা এমন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল যে, আল্লাহ্ তা'লা মুহাম্মদ (সা.)কে আদেশ করলেন, তুমি ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। এই প্রেক্ষিতেই হযরত মুহাম্মদ (সা.) ইহুদীদের ঘাটি খায়বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং ইহুদীদের পরাজিত করেন।

এরপর দেখুন ইহুদী এবং খ্রিষ্টানরা সেই প্যারাক্লিত মহামানব আহমদ (সা.)কে মানতে পারেনি। তাহলে সেই পবিত্র ভূমি জেরুযালেম থেকে মক্কাতে হিজরত করে তারা কি লাভ করল? কিছুই না বরং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আর যখন ইস্রাইল রাষ্ট্র হিসেবে ১৯৪৫ সালে প্রতিষ্ঠা পায় তখন তারা মক্কা থেকে পুনরায় হিযরত করে সেই জেরুযালেমেই ফিরে গেল। তাহলে তাদের পূর্বপুরুষদের সেই হিযরতের উদ্দেশ্য কোথায় গেল? আজ ইহুদী ও খ্রিষ্টানরা তওরাতের সেই ভবিষ্যদ্বাণী ভুলতে বসেছে। কিন্তু আমাদের মুসলমানদের তা ভুললে চলবে না। আমাদের উচিত এই সকল ইহুদী এবং খ্রিষ্টানদেরকে পুনরায় মনে করিয়ে দেওয়া যে, যেই আহমদের আসার কথা তওরাতে ও ইঞ্জিলে রয়েছে সেই আহমদ এসে গেছেন। অতএব হে ইহুদী ও খ্রিষ্টানরা! তোমরা হযরত মুহাম্মদ ও আহমদ মোস্তফা (সা.)কে মেনে তোমাদের নবী ও কিতাবের ভবিষ্যদ্বাণীকে পূর্ণ কর। এবং আল্লাহ্‌র ক্রোধভাজন হওয়া থেকে নিজেদেরকে রক্ষা কর।

আমাদের সকলেরই দোয়া করা উচিত আল্লাহ্ তা'লা সমস্ত ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের প্রতি রহম করুন যেন তারা হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর ওপর ঈমান আনতে পারে এবং হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর হাতে বয়আত করে পরিষ্কার-স্বচ্ছ ও খাঁটি ইসলামে দাখিল হতে পারে।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকেও ঈমানের সাথে আহমদীয়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার তৌফিক দান করুন, আমীন।

বীরগঞ্জ জামা'তের উদ্যোগে মসীহ মাওউদ দিবস পালিত

গত ২৫ মার্চ বাদ জুমুআ বীরগঞ্জ, দিনাজপুর জামা'তের উদ্যোগে মসীহ মাওউদ (আ.) দিবস সফলতার সাথে উদযাপন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মোহাম্মদ আব্দুল কাইয়ুম, প্রেসিডেন্ট, বীরগঞ্জ। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে পাঠ করেন জনাব জিয়াউল আহমদ খোকন। উর্দু নযম পাঠ করেন জনাব মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ। বক্তৃতা পর্বে ইমাম মাহদী (আ)-এর সত্যতার প্রমান, ইমাম মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাবসহ বিভিন্ন বিষয়ে পর্যায়ক্রমে বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব মোহাম্মদ আব্দুল হাকিম, ইশরাফুল আহমদ, মোহাম্মদ ইউসুফ আলী, মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ, জিয়াউল আহমদ খোকন এবং স্থানীয় মোয়াল্লেম মৌ. রাশেদুল ইমলাম। শেষে সভাপতির বক্তব্য ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। এতে ২২ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ আব্দুল কাইয়ুম

লাজনা ইমাইল্লাহ্ নারায়ণগঞ্জের উদ্যোগে মসীহ মাওউদ দিবস পালিত

নারায়ণগঞ্জ লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র উদ্যোগে গত ০৮/০৪/২০১৬ তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস সফলতার সাথে পালন করা হয়। স্থানীয় মজলিসের প্রেসিডেন্ট মাসুদা পারভেজ সাহেবার সভানেত্রীত্বে দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কাজ শুরু হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন সাজেদা রশীদ। নযম পাঠ করেন প্রতিভা পৃথি অহনা ও আমাতুল ওয়াকিল। অতঃপর বক্তৃতা পর্বে 'হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতার প্রমাণ'সহ অন্যান্য বিষয়ে পর্যায়ক্রমে বক্তব্য রাখেন সাদিয়া সালমা স্বর্ণা, ডা. শিমুল আহমদ এবং বুশরা আক্তার। সভানেত্রীর বক্তৃতা ও দোয়ার মাধ্যমে দিবসের সমাপ্তি হয়। অনুষ্ঠানে ৪৭ জন উপস্থিত ছিলেন।

উম্মে কুলসুম চায়না

সংবাদ

রাংটিয়া জামা'তে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ০৮/০৪/২০১৬ তারিখ বাদ জুমুআ রাংটিয়া জামা'তের উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় প্রেসিডেন্ট-এর সভাপতিত্বে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব আতিকুর রহমান, নযম পাঠ করেন জনাব মজনু হোসেন। বিশ্ব শান্তির দূত মহানবী বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শিক্ষা ও আদর্শের অনুকরণ ও অনুসরণ ব্যাতিরেকে বিশ্বময় শান্তি প্রতিষ্ঠা করা কোন ক্রমেই সম্ভব নয় এ বিষয়ের ওপর পর্যায়ক্রমে বক্তৃতা করেন জনাব এমরান আহমদ, মৌ. মিজানুর রহমান, জনাব আবু খালিদ মিয়া এবং মওলানা রবিউল ইসলাম। পরিশেষে সভাপতির সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ২ জন মেহমানসহ ৫৩ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ মিজানুর রহমান

ঢাকার মাদারটেক হালকায় সীরাতুন নবী (সা.) জলসা

গত ১৮ মার্চ শুক্রবার বেলা ৩-৩০ মিনিটে মাদারটেক হালকার উদ্যোগে মসজিদুল হুদায় সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী, আমীর, আহমদীয়া, মুসলিম জামা'ত, ঢাকা। সভাপতির আসন গ্রহণ করেন জনাব মোহম্মদ মাজেদুর রহমান ভুঁঞা, নায়েব যয়ীম আলা মজলিস আনসারুল্লাহ্ ঢাকা। আরও উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব এস এম রহমত উল্লাহ্। সভাপতির অনুমতিক্রমে অনুষ্ঠানটির সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন জনাব মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন ও জনাব সোহেল সাত্তার স্বপন। অনুষ্ঠানের শুরুতেই পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব আকবর হোসেন। উদ্বোধনী দোয়া পরিচালনা করেন সভাপতি। নযম পরিবেশন করেন জনাব মোহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া। রসূল (সা.) এর জীবনীর ওপর পর্যায়ক্রমে বক্তব্য রাখেন জনাব ইনসান আলী ফকির ও স্থানীয় প্রেসিডেন্ট।

এরপর রসূল করীম (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ইমাম মাহ্‌দী (আ.) এর আগমনের ওপর বক্তব্য রাখেন, মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার। বিশেষ নসিহতমূলক বক্তব্য ও দোয়া পরিচালনা করেন সভাপতি।

এতে জেরে তবলীগ ১২ জনসহ মোট ১২০ জন উপস্থিত ছিলেন।

শফিকুল হাকিম আহমদ

বিনীত দোয়ার আবেদন

আমাদের একমাত্র কন্যা 'আফিয়া আহমদ সপ্তর্ষী' বয়স ৫ বছর (ওয়াকফে নও, ১৭৭৪-বি), সে আড়াই বছর বয়সে পায়ে ব্যাথা পেয়ে বিভিন্ন অর্থোপেডিক ডাক্তারের চিকিৎসাধীন রয়েছে। আমাদের দেশের অর্থোপেডিক বিশেষজ্ঞগণ পরামর্শ দিয়েছেন অপারেশন করার। তাই চলতি মাসে (মে ২০১৬) ঢাকায় অবস্থিত 'হেলথ এন্ড হোপ স্পেশালাইজড হাসপাতালে' তার অপারেশন হওয়ার কথা রয়েছে। আফিয়ার পূর্ণ সুস্থ্যতা এবং দীর্ঘায়ূর জন্য সকলের কাছে বিনীতভাবে দোয়ার আবেদন করছি। আল্লাহ্ তা'লা যেন আমাদের একমাত্র কন্যাকে সেই সাথে সকল শিশুকে সুস্থ্য এবং নিরাপদ জীবন দান করেন। সকল শিশুর ভবিষ্যত সমুজ্জ্বল হোক এই দোয়া সবার কাছে প্রত্যাশা করছি।

দোয়াপ্রার্থী
মাহমুদ আহমদ সুমন
বাংলাডেস্ক, ঢাকা

সিরাতুন্নবী (সা:) জলসা
আহমদীয়া মুসলিম জামাত
নয়াপাড়া, জামালপুর।

জামালপুর জামা'তে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ২৯/০৪/২০১৬ তারিখ বাদ জুমুআ জামালপুর জামা'তের উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। জনাব হাবিুর রহমানের সভাপতিত্বে কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। উক্ত জলসায় মহানবী (সা.)এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে পর্যায়ক্রমে বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব হাবিবুর রহমান, আবু শামা, আনোয়ারুল ইসলাম এবং মওলানা মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম। সবশেষে স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব ছলিমুল্লাহ্‌র দোয়ার মাধ্যমে জলসার কার্যক্রম শেষ হয়। এতে ৭৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম

মজলিস আনসারুল্লাহ রাজশাহী রিজিওনাল কর্মশালা

গত ৮ এপ্রিল, ২০১৬ শুক্রবার মজলিস আনসারুল্লাহ বাংলাদেশের উদ্যোগে রাজশাহী রিজিওনাল কর্মশালা রাজশাহী মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ৯ঃ৩০ নায়েব সদর আউয়াল মোহাম্মদ আবদুল জলিলের সভাপতিত্বে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে কর্মশালার কার্যক্রম শুরু হয়। কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব নঈম আহমদ। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন রাজশাহী রিজিওনাল নাযেমে আলা জনাব আবদুল খালেক মোল্লা। কর্মশালার আয়োজন ও এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন সভাপতি। ৩৮তম মজলিস শূরার সুপারিশ বাস্তবায়নে মজলিসসমূহের দায়িত্ব ও ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা ও রিপোর্ট প্রদান করেন ১২টি মজলিস থেকে আগত যয়ীমে আলা ও যয়ীমগণের।

বিকাল ২ঃ৪৫ মিঃ কর্মশালা পুনরায় শুরু হয়। কর্মশালা এবং মজলিসে আনসারুল্লাহ, বাংলাদেশ কর্তৃক প্রনীত বার্ষিক কর্মক্যালেন্ডারের বাস্তবায়ন সম্পর্কে আলোচনা করেন রাজশাহী জামা'তের প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক আবদুল্লাহ সামস বিন তারেক। এরপর আলোচনা করেন জেলা নাযেমে আলা জনাব তারেক আহমদ চৌধুরী ও রিজিওনাল নাযেমে আলা জনাব আবদুল খালেক মোল্লা। কর্মশালায় রাজশাহী রিজিওয়নের ১৬টি মজলিসের মধ্যে ১২টি মজলিসের যয়ীমে আলা/যয়ীম ও তাদের মজলিসের প্রতিনিধিসহ মোট ৩৯জন উপস্থিত ছিলেন। অধিবেশনের শেষে আহামদ পাঠ ও দোয়ার মাধ্যমে কর্মশালা সমাপ্ত হয়।

তারেক আহমদ চৌধুরী

তবলীগ সভা
তারিখ ঃ ১৮ ই মার্চ ২০১৬ শুক্রবার বেলা ৩ টায়।
স্থান ঃ দারুত-তবলীগ কমপ্লেক্স।

ঢাকায় তবলীগি সভা অনুষ্ঠিত হয়

গত ১৮ মার্চ বেলা ৩টায় দারুত তবলীগ ও আজিমপুর হালকার যৌথ উদ্যোগে দারুত তবলীগ কমপ্লেক্সে তবলীগ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন জনাব শফিকুল হাকিম আহমদ। অনুষ্ঠানটির সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন মোহাম্মদ গোলাম মোর্তুজা। অনুষ্ঠানের শুরুতেই পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন হাফেজ মোহাম্মদ আজিজুর রহমান। দোয়া পরিচালনা করেন সভাপতি। নযম পাঠ করেন মোহাম্মদ হাফিজ উদ্দিন। বক্তৃতাপর্বে 'ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর আগমনের শুভ সংবাদ ও দাওয়াত' বিষয়ের ওপর মূল্যবান বক্তব্য প্রদান ও আগত অতিথিদের প্রশ্নের উত্তর দেন মওলানা শাহ্‌ মোহাম্মদ নূরুল আমীন। এরপর নযম পাঠ করেন মোহাম্মদ সহিদুল ইসলাম খোকন। সভাপতির দোয়ার মাধ্যমে সভার সমাপ্তি হয়। এতে ২১জন মেহমানসহ মোট ৮৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

শফিকুল হাকিম আহমদ

কটিয়াদীর মসূয়ায় সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ১৪/০৪/২০১৬ তারিখ কটিয়াদী জামা'তের অন্তর্গত মসূয়া হালকায় সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। বিকাল ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত অনুষ্ঠান চলে। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম ফয়জুল্লাহ্‌, নায়েব ন্যাশনাল আমীর। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব আশ্রাফ উদ্দিন ছোঁটন। নযম পাঠ করেন আফজাল আহমদ ইয়াছিন ও খলিল আহমদ। উদ্বোধনী ভাষণ ও দোয়া পরিচালনা করেন সভাপতি। 'মহানবী (সা.) এর বিদায় হজ্জের ভাষণ' এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান। 'মহানবী (সা.) এর ইসলাম প্রচার' এ সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন জনাব এম. এ. হান্নান, প্রেসিডেন্ট, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, কটিয়াদী। নযম পরিবেশন করেন মাসরূর আহমদ উৎস। 'সাহাবীগণের রসূল প্রেম' এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা মোহাম্মদ রাসেল সরকার। সমাপনী ভাষণ দান করেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। এতে ১৫০ জন উপস্থিত ছিলেন।

এম. এ. হান্নান

লাজনা ইমাইল্লাহ্‌ তেজগাঁও-এ নাসেরাত দিবস ও ওয়াকফে নও সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গত ২৯/০৪/২০১৬ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ তেজগাঁও লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র উদ্যোগে স্থানীয় জামে মসজিদে নাসেরাত দিবস এবং ওয়াকফে নও সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় লাজনা ইমাইল্লাহর প্রেসিডেন্ট শারমিন আক্তার শিখা। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন উপমা। বিভিন্ন নাসেরাতগণ পর্যায়ক্রমে বক্তৃতা করেন। নযম পাঠ করেন ঐশী।

ওয়াকফে নও সম্মেলনে ওয়াকফে নও বাচ্চাদের করণীয় কী, তাদের আচরণ কেমন হবে এবং পিতামাতার করণীয় বিষয়ে আলোচনা করেন মিসেস আরিফা রহমান। নযম পাঠ করেন অদিব ও মুহাম্মদ হোসেন। নাসেরাত ও আতফালদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবং পুরস্কার বিতরণ করা হয়। সবশেষে দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। এতে মোট ২৯ জন উপস্থিত ছিলেন।

ফারহানা মাহমুদ তন্বী

লাজনা ইমাইল্লাহ্‌ ঢাকার উদ্যোগে মসীহ্‌ মাওউদ দিবস পালিত

লাজনা ইমাইল্লাহ্‌ ঢাকার উদ্যোগে গত ২৫/০৩/২০১৬ তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ দারুত তবলীগ মসজিদে মসীহ্‌ মাওউদ (আ.) দিবস অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভানেত্রী ছিলেন রহিমা জাকির, ভাইস প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্‌ ঢাকা। প্রধান অতিথি ছিলেন আমাতুল কাইয়ূম, নায়েব সদর-১, লাজনা ইমাইল্লাহ্‌ বাংলাদেশ। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এতে দোয়া পরিচালনা করেন নায়েব সদর সাহেবা। হাদীস ও মলফুযাত পাঠ করেন তাহেরা মারুফ। 'ইমাম মাহ্‌দী (আ.) এর আগমনের উদ্দেশ্য এবং প্রয়োজনিয়তা' বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন আসমা আহমদ। বাংলা নযম পরিবেশন করেন শারমিন আরিফ। 'হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) এর আনুগত ও ভালবাসা' সম্পর্কে বক্তৃতা করেন আমাতুল কাইয়ূম, নায়েব সদর-১। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

শাহাজাদী রোকেয়া

রাজশাহী জামা'তের উদ্যোগে মসীহ্‌ মাওউদ দিবস পালিত

গত ২৩ শে মার্চ, ২০১৬ বাদ মাগরিব হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আ.) দিবস পালন করা হয়। স্থানীয় প্রেসিডেন্টের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব মোহাম্মদ ইমরান হোসেন। উর্দু নযম পেশ করেন জনাব কৌশিক আহমদ। বক্তৃতাপর্বে মসীহ্‌ মাওউদ (আ.) দিবসের পটভূমি, বংশ পরিচয় ও বাল্যকাল, দাবির পূর্ববর্তী জীবন, যুগের কয়েকটি লক্ষণ এবং মসীহ্‌ মাওউদ (আ.) এর কর্মময় জীবন বিষয়ে পর্যায়ক্রমে বক্তব্য রাখেন তানভীর করিম সামী, নুসরাত জাহান ঐশী, ড. হাদীকাতুল জান্নাত আল মাহমুদা, জনাব তৌকির আহমদ চৌধুরী, আলহাজ্জ প্রফেসর ড. তারিক সাইফুল ইসলাম এবং ডা. এনামুর রহমান। সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। এতে প্রায় ৫০ জন উপস্থিত ছিলেন।

আব্দুল্লাহ্‌ শামস বিন তারিক

ভিউ বিয়াম ল্যাবরেটরী স্কুল,ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
VIEW BIAM LABORATORY SCHOOL,BRAHMANBARIA.
বিনামূল্যে রক্তের গ্রুপ সনাক্তকরণ

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, ব্রাক্ষ্মণবাড়িয়ার বিনামূল্যে সেবা প্রদান

বাংলা নববর্ষ ১৪২৩ পদার্পণ উপলক্ষে গত ১লা বৈশাখ-১৪২৩ বঙ্গাব্দ (১৪ই এপ্রিল ২০১৬) তারিখ মোতাবেক রোজ বৃহস্পতিবার মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, ব্রাক্ষ্মণবাড়িয়ার উদ্যোগে হিউম্যানিটি ফার্স্ট এর ব্যানারে মানব সেবামূলক একটি বিশেষ কর্মসূচী বাস্তবায়িত হয়। এ বছর ব্রাক্ষ্মণবাড়িয়া রেলওয়ে স্টেশন, ব্রাক্ষ্মণবাড়িয়া ফারুকী পার্ক, পার্ক সংলগ্ন অবকাশ অফিসার্স কোয়াটার পাশে ব্যায়াম ল্যাবরেটরী স্কুল এর সামনে তিনটি স্পটে একযোগে বিনামূল্যে বিশুদ্ধ পানি পান করানো এবং রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা করানো হয়। সকাল ৮.০০মি. হতে সেবাদান কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে আরম্ভ করা হয়। সকাল ৯.৩০মি.-এ আমাদের প্রোগাম পরিদর্শনে আসেন জেলা প্রশাসক ড. মোশাররফ হুসেন এবং উধ্বর্তন কর্মকর্তা ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। এসময় জেলা প্রশাসক আমাদের কাজের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানেন এবং বিগত সময়ে সংস্থাটির কাজের ও কর্মীদের প্রশংসা করেন ও ধন্যবাদ জানান। উল্লেখ্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে কর্মীদের দেশজ ঐতিহ্যবাহী খাবার মুড়ির মোয়া দিয়ে আপ্যায়ণ করান। বিকালে ৩.৪৫মি.-এ জনাব এখতিয়ার উদ্দিন শুভ, কায়েদ, ব্রাক্ষ্মণবাড়িয়া সকল কর্মীদের ধন্যবাদ জানান এবং প্রোগ্রাম এর সমাপ্তি ঘোষণা করেন। সেবা প্রোগ্রামের সময় মোহতরম আমীর সাহেব ব্রাক্ষ্মণবাড়িয়া এবং জামাতের কয়েকজন কর্মকর্তা উপস্থিত থেকে কর্মীদের উৎসাহ দেন এবং সার্বিক সহযোগিতা করেন। ৩২জন খোদ্দাম ও ৮জন আতফাল দিনব্যাপী নিরলস পরিশ্রম করেন। রেকর্ড অনুযায়ী এই সময়ে প্রায় ৮০০ লিটার বিশুদ্ধ পানি এবং ২৪৪জন প্রাপ্ত বয়স্কের রক্তের গ্রুপ বিনামূল্যে শনাক্ত করা হয়। স্থানীয় ৪টি দৈনিক পত্রিকা তাদের স্ব উদ্যোগে প্রতিবেদন প্রকাশ করে।

দেলোয়ার হুসেন মুন্না

লাজনা ইমাইল্লাহ আহমদনগরের উদ্যোগে পুস্তক সেমিনার ও পিঠা উৎসব অনুষ্ঠিত

গত ৩০ এপ্রিল রোজ শনিবার লাজনা ইমাইল্লাহ আহমদনগরের উদ্যোগে স্থানীয় জামে মসজিদে লাজনা ইমাইল্লাহর প্রেসিডেন্ট সাহেবার সভাপতিত্বে তরবিয়তে আওলাদ পুস্তকের ওপর এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

সেমিনারে পুস্তক পাঠ করে শুনান নিলুফা ইয়াসমিন। পুস্তকের ওপর পরীক্ষায় অংশ নিয়ে ১৫জন পুরস্কার লাভ করেন। এছাড়া ৮০জন লাজনা উক্ত পুস্তকটি পাঠ শেষ করেন। সেমিনারে ৯৭জন উপস্থিত ছিলেন। একই স্থানে গত ১৪ এপ্রিল পিঠা উৎসবের আয়োজন করা হয়।

এই উৎসবের সূচনা হয় বিলকিস তাহেরের পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত এবং স্থানীয় লাজনা ইমাইল্লাহর প্রেসিডেন্ট সাহেবার দোয়ার মাধ্যমে। এতে লাজনা ইমাইল্লাহর সদস্যাগণ বিভিন্ন পিঠা তৈরী করে প্রদর্শন ও খাবারের ব্যবস্থা করেন। উৎসব চলাকালে পর্যায়ক্রমে নযম পাঠ করেন নাসিমা বশীর, নাফিয়া বেগম এবং শাহিনা সেলিম। দোয়ার মাধ্যমে পিঠা উৎসবের সমাপ্তি ঘটে।

শাহিনা সেলিম

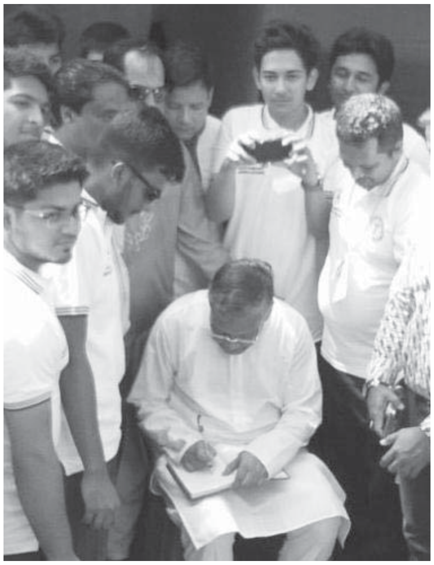

মন্তব্য বহিতে মন্তব্য লিখছেন
সাংসদ সদস্য জনাব জিয়াউদ্দীন বাবলু

চট্টগ্রামে বিনামূল্যে বিশুদ্ধ পানি বিতরণ কর্মসূচি

গত ১৪ই এপ্রিল ২০১৬ পহেলা বৈশাখ ১৪২৩ উপলক্ষ্যে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া চট্টগ্রাম, চট্টগ্রামের সি.আরবি. প্রাঙ্গনে বিনামূল্যে বিশুদ্ধ পানি বিতরণ কর্মসূচি পালন করে। পহেলা বৈশাখে চট্টগ্রামের সি.আর.বি প্রাঙ্গন লোকে-লোকারণ্য হয়ে উঠে। এ দিন প্রচন্ড গরম ও খরতাপের কারণে মানুষ তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়ে। তৃষ্ণার্ত মানুষদের সেবা প্রদানকল্পে এ স্থানকে নির্বাচন করা হয়। দোয়ার মাধ্যমে এ কর্মসূচি শুরু হয়। সকাল ৬.৩০টা হতে বিকাল ৫টা পর্যন্ত সারাদিন ব্যাপি এ কর্মসূচির মাধ্যমে প্রায় ১০,০০০জন পিপাসার্ত মানুষকে সুপেয় পানি পানের সেবা প্রদান করা হয়। এ কর্মসূচির মাধ্যমে সাধারণ জনসাধারণের মনে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয় এবং মন্তব্য বহিতে সাংসদ সদস্য জনাব জিয়াউদ্দীন বাবলুসহ আরো অনেকেই তাদের মনোভাব প্রকাশ করেন এবং এ কর্মসূচীর ভূয়সী প্রশংসা করেন। এ কর্মসূচির মাধ্যমে জনসাধারণকে সেবা প্রদানকল্পে ২১জন খোদ্দাম ও ৩জন আতফাল অংশগ্রহণ করে। পরিশেষে, দোয়ার মাধ্যমে এ কর্মসূচি সমাপ্ত হয়।

উল্লেখ্য, ১৩ই এপ্রিল দিবাগত রাতে বাজামাত তাহাজ্জুদ নামায আদায় করা হয়। এতে অংশ নেয় ৮জন খোদ্দাম ও ৩জন আতফাল।

কায়েদ, চট্টগ্রাম

আন্তর্জাতিক জামা’তি সংবাদ

হযরত আমীরুল মু’মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর জুমুআর খুতবার সংক্ষিপ্তরূপ

গত ৬ই মে, ২০১৬ রোজ শুক্রবার ডেনমার্কের নুসরত জাহান মসজিদে প্রদত্ত জুমুআর খুতবার শুরুতে হুযূর আনোয়ার (আই.) ডেনমার্ক জামা’তের উন্নতি ও অগ্রগতির বর্ণনা দেন। তিনি বলেন, ১১বছর আগে আমি এখানে এসেছিলাম তখনকার তুলনায় আজ ডেনমার্ক জামাত সর্বক্ষেত্রে উন্নতি করেছে। জামাতের সহায়-সম্পদ বেড়েছে এবং সদস্য সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। আল্লাহ্ নিজ অপার করুণায় এসব উন্নতি দিয়েছেন, এজন্য আল্লাহ্‌র প্রতি আমাদের সবার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন আবশ্যক।

এরপর হুযূর বলেন, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কীভাবে করতে হয় তা আমাদের হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)- এর কাছ থেকে শেখা উচিত।

এরপর হুযূর (আই.) ডেনমার্কে বসবাসকারী আহমদীদের উদ্দেশ্য করে বলেন, আল্লাহ্ আপনাদের পিতা-পিতামহদের ওপর বিশেষ অনুগ্রহ করেছেন বিধায় তারা আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিলেন। আজ আপনারা জ্যেষ্ঠদের কল্যাণে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধে ভোগ করছেন। এখন জাগতিক চাকচিক্য এবং বৈষয়িক উন্নতির কারণে যদি আপনারা ধর্ম থেকে দূরে সরে যান এবং ধর্মীয় বিষয়াদির প্রতি আপনাদের মনোযোগের অভাব দেখা দেয় তাহলে আপনাদের আগামী প্রজন্ম আহমদীয়াত থেকে দূরে সরে যাবে আর পুর্বপুরুষদের দোয়া ও পুণ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে। কাজেই আপনারা আত্মবিশ্লেণ করুন এবং যেসব ক্ষেত্রে নিজেদের ঘাটতি ও দুর্বলতা রয়েছে সেগুলোকে চিহ্নিত করে আত্মসংশোধনের প্রতি মনোযোগ দিন। যদি এমনটি করেন তাহলে আপনাদের পূণ্য কাজের পুরস্কার আল্লাহ্ অবশ্যই দিবেন এবং আপনাদের বংশধররাও এথেকে কল্যাণমণ্ডিত হবে।

এরপর হুযুর (আই.) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নিজ জামাতের কাছে কি প্রত্যাশা রেখেছেন এবং এই জামাত গঠনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি সম্পর্কে তাঁর রচনাসমগ্র হতে বিভিন্ন অংশ পাঠ করেন। যার বিষয়বস্তু ছিল, তাক্বওয়া, ইবাদত, নামায, ধর্মকে পার্থিবতার ওপর প্রাধান্য দেয়া, মানুষের প্রতি সদয় হওয়া, ক্রোধ সংবরণ করা ইত্যাদি।

তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ্ জীবিতদের সমন্বয়ে একটি নতুন দল গঠন করতে চান বলেই এই জামাত প্রতিষ্ঠা করেছেন। আমরা জীবিত হওয়ার জন্য বয়আত করেছি তাই আমাদেরকে জীবিত থাকার সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর গৃহের চতুর্সীমার মধ্যে যারা প্রবেশ করেন আল্লাহ্ তাদেরকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কিন্তু যারা শুধুমাত্র নামে মাত্র বয়আত করে এবং তাঁর সাথে কৃত অঙ্গীকার পালনে যত্নবান নয় তাদের বিষয়ে আল্লাহ্ দায়িত্বমুক্ত। তিনি (আ.) আরো বলেন, এই অন্ধকার ও অমানিশার যুগে ধর্মের প্রতি কারো মনোযোগ নেই, কারো অধিকারের প্রতি কারো ভ্রুক্ষেপ নেই, সবাই পার্থিব কাজে মগ্ন, পার্থিব ক্ষতির হাত থেকে বাঁচার জন্য আধ্যাতিক ক্ষতিকে বরণ করে নিতেও তারা প্রস্তুত। যেমন, অনেকেই মামলা-মোকদ্দমায় জেতার জন্য মিথ্যার আশ্রয় নেয়। পাপ থেকে যদি কেউ বিরত থাকে তবে তা পুণ্যের জন্য নয়, বরং জাগতিক শাস্তির ভয়ে। ভয় দূর হয়ে গেলেই সাথে সাথে পাপাচারে লিপ্ত হয়। বর্তমানে সত্যিকার তাক্বওয়া উঠে গেছে। যখন খোদা তা’লা নিজ ফসলকে নষ্ট হতে দেখেন তখন তিনি নতুন ফসল নিয়ে আসেন। যেমন পবিত্র কুরআনে রয়েছে, নিশ্চই আমরা এই যিকিরকে অবতীর্ণ করেছি আর আমরাই এর সুরক্ষা করব। আল্লাহ্ তা’লা দেখেন যে, মানুষের অন্তর তাক্বওয়া শূন্য হয় যাচ্ছে। তাই তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে পাঠিয়েছেন কেননা; তিনি একটি নতুন জাতি সৃষ্টি করতে চান।

হুযূর (আই.) বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যখন এ কথাগুলো বলেছেন তখনই যে কেবল এরূপ পরিস্থিতি বিরাজমান ছিল তাই নয় বরং আজও বিদ্যমান। তিনি আরও বলেন, অন্যদের কথা বাদ দিলেও আমরা যারা আহমদী, যারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে মেনেছি, আমরা কি পার্থিব কাজের ওপর ইবাদতকে প্রাধান্য দেই? যদি সময়মত নামায পড়িও তাও কোনরকম মাথার বোঝা ছুঁড়ে ফেলার মত তাড়াহুড়ো করে পড়ি। পার্থিবতার ওপর ধর্মকে অগ্রাধিকার প্রদানের অঙ্গীকার রক্ষায় আমরা কতটা যত্নবান? ইহসান বা অনুগ্রহের আদেশ দেয়া হয়েছে, অনুগ্রহ তো দূরের বিষয় আমাদের মধ্যে অনেকে অন্যের প্রাপ্য অধিকারও খর্ব করছে।

হুযূর বলেন, আমরা জীবিতদের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য বয়আত করেছি তাই আমাদের উচিত সর্বদা হযরত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর নির্দেশাবলীর প্রতি দৃষ্টি রাখা। আল্লাহ্‌কে পাওয়ার চেষ্টা করা। আর পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ বলেছেন, আর যারা আমাদের উদ্দেশ্যে চেষ্টা-সাধনা করে আমরা তাদেরকে আমাদের পথে পরিচালিত করবো। এ আয়াতে দেয়া প্রতিশ্রুতি অনুসারে মানুষ যখন আল্লাহ্‌কে পাবার জন্য চেষ্টা করে তখন তিনি স্বয়ং বান্দাকে হাতে ধরে তাকে সুপথে পরিচালিত করেন।

হুযূর বলেন, যদি কারো হৃদয় অমানিশায় ছেয়ে থাকে তাহলে তার ইবাদত ও দোয়া কোন কাজে আসে না। বিশ্বাসের দিক থেকে ঠিক থাকলে অন্তর পরিস্কার না থাকার কারণে তার সব দোয়া ও চেষ্টা সাধনা বৃথা যায়। তাই আমাদের নিজ অন্তরকে কলুষমুক্ত করার চেষ্টা করা উচিত। অন্তর পরিস্কার না হলে এমন লোকদের ইবাদত ও দোয়া আল্লাহ্ তাদের মুখে ছুঁড়ে মারেন। আর যদি মানুষের অন্তরাত্মা পরিস্কার হয় তাহলে খোদা স্বয়ং তাদের অভিভাবক হয়ে যান।

এরপর হুযূর মসীহ্ মাওউদ (আ.) ভাষায় মানুষের ঈমানকে মজবুত করার জন্য সৎকর্মের আবশ্যকতা এবং এর গুরুত্ব বর্ণনা করেন। খুতবার শেষাংশে হুযূর বলেন, হাদীসে আছে, কেউ যদি আল্লাহ্‌র পানে সামান্য জোরে হাঁটে তাহলে আল্লাহ্ তার কাছে দ্রুত ছুটে যান। আল্লাহ্‌র কাছে আমার প্রার্থনা– আমরা যেন নিজেদের ঈমানকে সুদৃঢ় করি, আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধের ওপর আমল করতঃ তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনকারী হই, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আতের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনকারী হই, নিজেদের আমল দ্বারা বিশ্ববাসীকে সত্যের পথ প্রদর্শনকারী হই আর আমাদের প্রতি আল্লাহ্ তা’লা যেসব অনুগ্রহ করেছেন সত্যিকার অর্থে এজন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী হই। আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে এর তৌফিক দিন, আমীন।

বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে হুযূর (আই.)-এর বিশেষ দোয়ার তাহরীক

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) গত ২ অক্টোবর, ২০১৫ ইং, রোজ শুক্রবার লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে জুমুআর খুতবায় নিম্নোক্ত তিনটি দোয়া বেশি বেশি পড়ার প্রতি জামা'তের সকল সদস্যকে নসীহত প্রদান করেন।

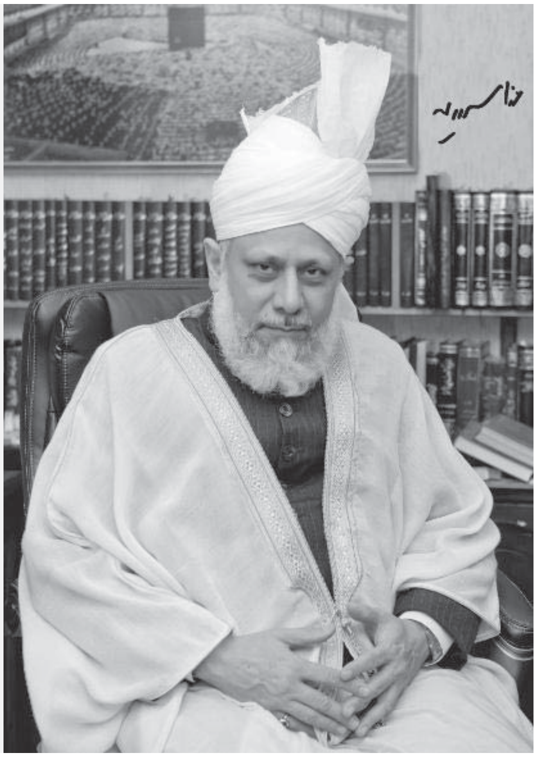

رَبِّ كُلُّ شَيْءٍ خَادِمُکَ
رَبِّ فَاحْفَظْنِی وَانْصُرْنِی وَارْحَمْنِی

"রাব্বি কুল্লু শায়ইন খাদিমুকা রাব্বি ফা'হফায্‌নী ওয়ানসুরনী ওয়ারহামনী।"

অর্থ : হে আল্লাহ্! সবকিছুই তোমার সেবায় নিয়োজিত। অতএব, হে আমার প্রভু! তুমি আমার নিরাপত্তা বিধান কর আর আমাকে সাহায্য কর এবং আমার প্রতি দয়া কর।

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُکَ فِیْ نُحُوْرِهِمْ
وَنَعُوْذُبِکَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ

"আল্লাহুম্মা ইন্না নাজ্‌আলুকা ফী নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম।"

অর্থ : হে আমার আল্লাহ্! আমরা তোমাকে তাদের বক্ষদেশে স্থাপন করছি এবং তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

رَبَّنَاۤ اٰتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَّ فِی الْاٰخِرَةِ
حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠٢﴾

"রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাওঁ ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়াকিনা আযাবান্নার।"

অর্থ : হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমাদেরকে এ দুনিয়াতে এবং পরকালে যাবতীয় মঙ্গল দান কর এবং আগুনের আযাব থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর।

*** এছাড়া হুযূর (আই.) ইস্তেগফার করার প্রতিও গুরুত্বারোপ করেন।**

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّیْ مِنْ كُلِّ
ذَنْبٍ وَّ اَتُوْبُ اِلَیْهِ

"আসতাগফিরুল্লাহা রাব্বী মিন কুল্লি যামবিওঁ ওয়া আতূবু ইলাইহি।"

অর্থ : আমি আমার প্রভুর নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আর তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন করছি।

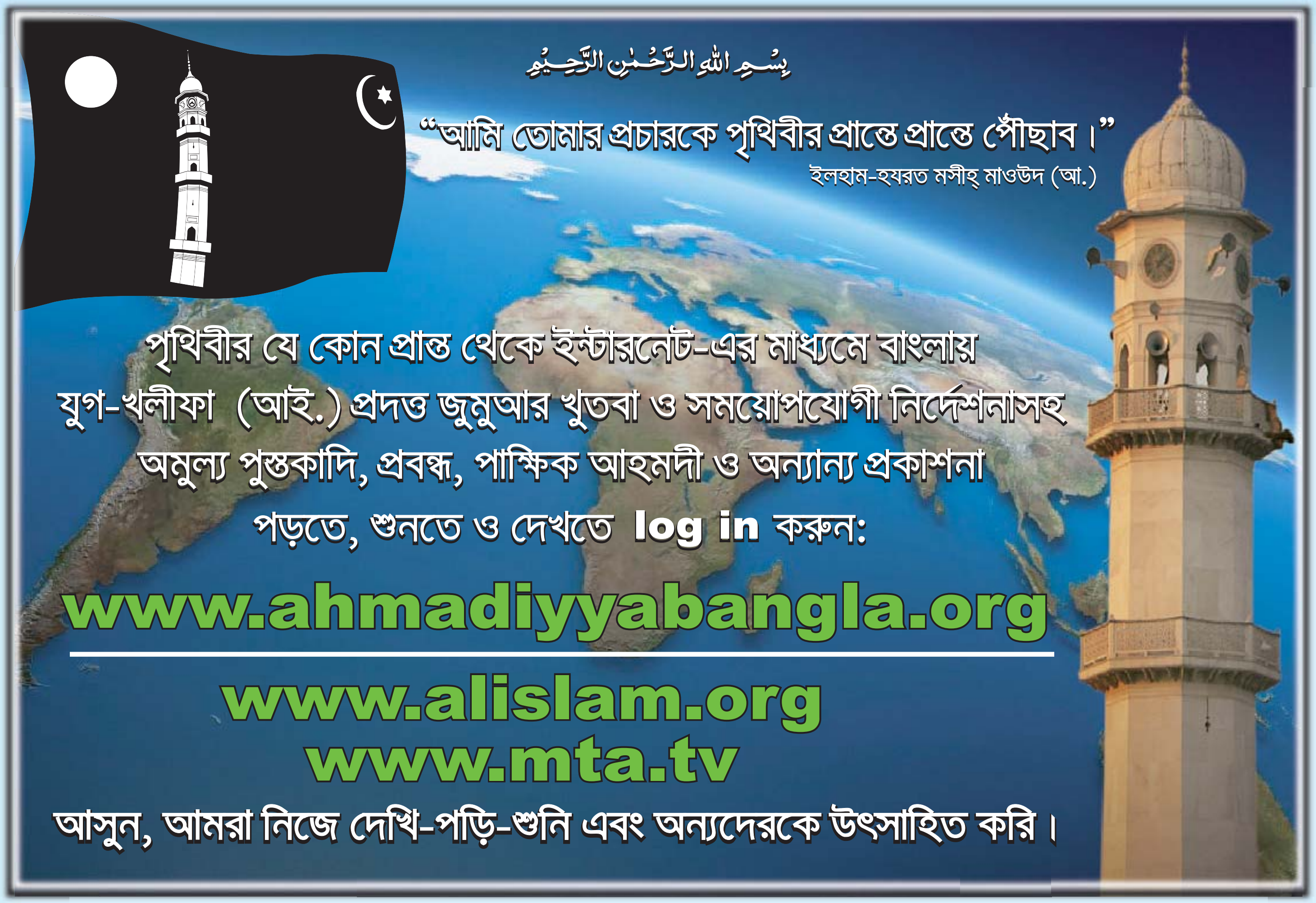

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

"আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাব।"
ইলহাম-হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে বাংলায়
যুগ-খলীফা (আই.) প্রদত্ত জুমুআর খুতবা ও সময়োপযোগী নির্দেশনাসহ
অমূল্য পুস্তকাদি, প্রবন্ধ, পাক্ষিক আহমদী ও অন্যান্য প্রকাশনা
পড়তে, শুনতে ও দেখতে **log in** করুন:

www.ahmadiyyabangla.org

www.alislam.org
www.mta.tv

আসুন, আমরা নিজে দেখি-পড়ি-শুনি এবং অন্যদেরকে উৎসাহিত করি।

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

হাড়-জোড়া, বাত-ব্যথা, স্পাইন এবং
আঘাত জনিত রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

ডাঃ মোঃ গোলাম রহমান (দুলাল)
এমবিবিএস, ডি-অর্থো (পঙ্গু হাসপাতাল)
এমএস (অর্থো)
সহযোগী অধ্যাপক, অর্থোপেডিক বিভাগ
সাহাবউদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
মোবাইল: ০১৭১২-০৯০৮২৬

চেম্বার :
ইবনে সিনা ডায়াগনোস্টিক এন্ড কনসালটেশন সেন্টার, বাড্ডা
বাড়ি নং- চ-৭২/১, প্রগতি স্বরণী, উত্তর বাড্ডা
ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ।

সিরিয়ালের জন্য:
ফোন : +৮৮০ ২ ৮৮৩৫৫৫৬-৭
মোবাইল : ০১৮৩২-৮২০৯৫০

সময় : বিকেল ৫.০০টা থেকে ৮.৩০টা (শুক্রবার বন্ধ)
(বাড্ডা হোসেইন মার্কেটের বিপরীতে)

AMECON
NIAZ METALLIC

Meer Hasan Ali Niaz
Founder

Mobile: 01713001536, 01973001536
H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari,
Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office
Palbari More, New Khairtola
Jessore. Tel : 67284

Bogra Office
Kanas Gari, Sherpur Road
Bogra. Tel : 73315

Chittagong Office
205, Baizid Bostami Road
Ctg. Tel : 682216

ameconniaz@yahoo.com

15th May, 2016 Tk. 20.00
New Vol. No. 78 | 21 Issue
The Ahmadi Fortnightly
Since 1922
Regd. No. D. A.-12

জলই জীবন/ WATER THERAPY

জল চিকিৎসায় নিম্নবর্ণিত রোগসমূহ নিরাময় হয় :

(১) কোষ্ঠ কাঠিন্য (Constipation)- ১০ দিন পর এই চিকিৎসায় সর্বপ্রথম ফল পাবেন, (২) পাকাশয়জনিত রোগসমূহ (Gastric Problems)- ১০ দিন, (৩) উচ্চ রক্তচাপ (Hipertension)-১ মাস, (৪) বহুমুত্র (Diabetes)-১ মাস, (৫) ক্ষয়রোগ (Tuberculosis)-৩ মাস, (৬) চক্ষুকর্ণ নাসিকা রোগ (ENT Diseases)-৩ মাস, (৭) মুত্রথলী গ্রন্থি বৃদ্ধি রোগ (Enlargement of Prostate Gland)-৩ মাস, (৮) কর্কট রোগ (Cancer)-প্রথম থেকে রোগ ধরা পরলে ৬ মাস, (৯) পুরনো কঠিন চর্মরোগ-১ বছর।

জল চিকিৎসার নিয়ম :

(১) ঘুম থেকে উঠে মুখ না ধুয়ে কুলকুচি না করে (without mouth washing) শান্তভাবে ধীরে ধীরে ১.২৬০ লিটার অর্থাৎ বড় গ্লাসের ৪ গ্লাস জল পান করতে হবে। তাড়াহুড়া করা যাবে না। জলপান করার পর ৪৫ মিনিট কোন তরল বা শক্ত খাদ্য (Liquid or solid food) খাওয়া যাবে না। ধূমপান করা যাবে না।

(২) প্রাতঃরাশ, দুপুর ও রাতের আহার (Breakfast, Lunch and Dinner) করার সময় জল পান করা যাবে না। অসুবিধা হলে গলা ভেজাবার জন্য ২/৩ চামচ পরিমাণ জল খেতে পারেন। এই পরিমাণ বাড়ানো যাবে না। দুই ঘন্টা পর ইচ্ছেমত জল পান করা যাবে, দুর্বল বা অসুস্থ হলে চার গ্লাসের পরিবর্তে ১ অথবা ২ গ্লাস দিয়ে শুরু করতে পারেন। তবে অবশ্যই চার গ্লাস পান করতে হবে। যে কোন রোগই জল চিকিৎসায় নিরাময় হতে পারে। বাতজনিত রোগে প্রথম ৭ দিন সকালে ও বিকালে ২ বার এই চিকিৎসা করতে হবে। উপশমের পর শুধু সকালে করলে চলবে।

(৩) দুপুর ও রাত্রে আহার করে শোয়ার পূর্বে অন্ততঃ আধাঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে। ঘুমানোর পূর্বে কোন কিছু আহার করা যাবে না। অসুবিধা মনে হলে ঘুমানোর আগে ২/৩ চামচ জল পান করা যাবে।

ধানসিড়ি রেস্তোরা
ধানসিড়ি রেস্তোরা-১
নীচ তলা
রোড নং ৪৫, প্লট ৩২/এ, গুলশান- ২, ঢাকা- ১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫০৩২৩,
০১৯১৩৯৪১৩৯২, ০১৯১৯২৭১২৮৬

ধানসিড়ি রেস্তোরা-১
অর্কিড প্লাজা (তৃতীয় তলা)
(রাপা প্লাজার দক্ষিণ পার্শ্বে)
ধানমন্ডি, ঢাকা।
ফোন : ৯১৩৬৭২২, ০১৮১৯০৯৯০৩৫

"দিল মেঁ য়্যাহী হ্যা হার্‌দাম তেরা সাহীফা চুমুঁ
কুরআঁ কে গিরদ্‌ ঘুমুঁ কা'বা মেরা য়্যাহী হ্যা"

আমার আন্তরিক বাসনা হলো, সর্বদা যেন তোমার কিতাব চুম্বন করি আর কুরআনের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করি; বস্তুত আমার কা'বা এটাই।
–হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

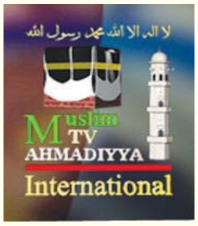

mta INTERNATIONAL

এমটিএ দেখুন
অবক্ষয়মুক্ত থাকুন!

বিজ্ঞাপনের জন্য
যোগাযোগ করুন
০১৭১৬-২৫৩২১৬

এমটিএ-তে সরাসরি হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনুন এবং নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত রাখুন

এমটিএ-তে খুতবা প্রচারের সময় সূচি

(১) শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬.০০ সরাসরি সম্প্রচার। পুনঃপ্রচার রাত ৯.২০ মিনিট এবং রাত ৩.০০।

(২) শনিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সকাল ৮.১০ এবং বিকাল ৫.০০।

(৩) রবিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০।

(৪) বৃহস্পতিবার একই খুতবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় রাত ৮.০০।

Printed and Published by **Mahbub Hossain** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv
Phone: 57300808, 57300849, Fax: 0088-2-57300880, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com